গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৬ বর্ষ ৩৬ সংখ্যা | ২৬ এপ্রিল - ২ মে ২০২৪ | Web: https://ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

‘এ পার্টির মূল শক্তি সঠিক আদর্শ ও সঠিক রাস্তা’

২৪ এপ্রিল পার্টি প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম স্মরণ করুন

“আমরা যখন দল গঠন করি, তখন আমরা কারা? আমাদের তখন কিছুই ছিল না। আমাদের নাম করা কোনও নেতা ছিল না, টাকাপয়সা ছিল না, আমরাই একমাত্র পার্টি যার সোসাল ব্যাকিং (সামাজিক সমর্থন) বা সোসাল হাইআপ সোর্স (উঁচুতলার থেকে প্রাপ্তিযোগ) যাকে বলে তা ছিল না। একটা পয়সাওয়ালা লোক বা এ ধরনের কোনও সিমপ্যাথাইজারও (দরদি) তখন আমাদের গড়ে ওঠেনি। পাঁচ-দশটা লোক যারা পার্টিকে মোটা অঙ্কের টাকা দিতে পারে এরকম কাউকে তখন আমরা পাইনি। অত্যন্ত কমন ম্যান এবং সাধারণ মধ্যবিত্ত

আটের পাতায় দেখুন

বিজেপি শাসনে নারী উন্নয়ন শুধুই জুমলা

মহিলাদের উন্নয়নে কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদি সরকারের ‘প্রবল আগ্রহ’ শুধুমাত্র বিজেপি নেতা-মন্ত্রীদের ভাষণে সীমাবদ্ধ— এমন বললে কিন্তু ভুল অভিযোগ করা হবে। সেই ২০১৪ সালে প্রথমবার কেন্দ্রীয় সরকারে বসার আগে তাদের নির্বাচনী ইস্তেহারেও বিজেপি ‘সমাজ ও জাতির বিকাশ ও উন্নয়নে নারীশক্তির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা’র কথা উল্লেখ করেছিল, প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল নারীদের ‘ক্ষমতায়ন ও কল্যাণে দায়বদ্ধ’ থাকার। সেই যে তারা ‘জাতি নির্মাণের কারিগর’ বলে দেশের নারীসমাজের স্তুতি শুরু করেছিল, এ বারেও তার কমতি

সাতের পাতায় দেখুন

গুজরাটে দলের নির্বাচনী প্রচার

গুজরাটে নভসারি কেন্দ্রের এস ইউ সি আই (সি) প্রার্থী কমরেড কানুভাই খাদোদিয়ার প্রচারে সভা

কর্পোরেটকে অরণ্য ধ্বংসের অবাধ ছাড়পত্র বিজেপি সরকারের

আঠারোতম লোকসভা নির্বাচনের প্রক্রিয়া চলছে। ক্ষমতাসীন বা বিরোধী সব রাজনৈতিক দলই প্রতিশ্রুতির ঝুলি নিয়ে জনতার দরবারে যাচ্ছে। দেশের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীগুলির জন্যও এই প্রতিশ্রুতির কমতি কোনও দিনই হয়নি। সংসদীয় দলগুলি আদিবাসী, চিরাচরিত বনবাসী সহ পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর মানুষকে ভোটব্যাঙ্ক হিসাবে হাতে রাখার জন্য কিছু চমক নানা সময় দিয়েছে।

এখন আবার আদিবাসীদের সম্মানার্থে কেন্দ্রীয় সরকার পালন করেছে ‘জনজাতীয় গৌরব দিবস’, বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা যথাসময়ে পাওয়ার কথা বলে ঘোষিত হয়েছে ‘বিকাশ ভারত সংকল্প যাত্রা’, সংকটগ্রস্ত আদিবাসীদের উন্নতির জন্য জন-মন মিশন, বনজ সম্পদ বিক্রি করে আয়ের জন্য বিশেষ প্রকল্প ও আদিবাসী মহিলাদের জন্য সেলফ হেলপ গ্রুপ সহ নানা সুবিধার ঘোষণা হয়েছে। কিন্তু গর্জন যত বেশি, বাস্তবে বর্ষণ ততই কম।

অরণ্যের অধিকার কর্পোরেটের হাতে

প্রথমেই আসা যাক অরণ্যের উপর আদিবাসী এবং চিরাচরিত বনবাসী নানা গোষ্ঠীর দরিদ্র মানুষের সুদীর্ঘ অধিকারের প্রশ্নে। তাঁদের বিকাশের সাথে এই অধিকার ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। অরণ্যের অধিকারকে পুরোপুরি একচেটিয়া পুঁজির মালিকানাধীন কর্পোরেটদের হাতে তুলে দিয়েছে কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকার। গত বছর ২৬ জুলাই লোকসভা ও রাজ্যসভায় মণিপুর নিয়ে টানা গণ্ডগোল বাধিয়ে রেখে কোনও আলোচনার সুযোগ না দিয়েই বিজেপি সরকার ‘বন (সংরক্ষণ) বিল-২০২৩’ পাশ করিয়ে নিয়েছিল। এমনিতেই বনাঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্পদ দখল করে টুরিজমের নামে বিস্তীর্ণ এলাকার পরিবেশ ধ্বংস করা, বনভূমি বা পাহাড়ের অভ্যন্তরে থাকা খনিজ উত্তোলনের জন্য বিজ্ঞানসম্মত নিয়মনীতি মেনে চলা, পরিবেশ আইন মানা প্রভৃতি কোনও কিছুর তোয়াক্কা

দুয়ের পাতায় দেখুন

শুধু নির্বাচনী বন্ড নয়

অন্য উপায়েও টাকা নিয়েছে শাসক দলগুলি

কোন দল কাদের স্বার্থ রক্ষায় কাজ করে তা বোঝার অন্যতম উপায় হল কারা তাদের টাকা দেয় তা দেখা। এই নিরিখে এই মুহূর্তে ভারতে নির্বাচনী দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ বৃহৎ দলগুলির মধ্যে কোনও পার্থক্যই দেখা যাচ্ছে না। এস ইউ সি আই (সি) একমাত্র দল যারা কেবলমাত্র সাধারণ মানুষের কাছ থেকে সংগ্রহ করা সাহায্যের জোরেই নির্বাচনী এবং গণআন্দোলনের সমস্ত কর্মকাণ্ড পরিচালিত করে।

অমিত শাহ বলেছেন, নির্বাচনী বন্ড বাতিল হয়ে ট্রাস্টের মতো সংস্থার মাধ্যমে রাজনৈতিক দলকে চাঁদা দেওয়ার ব্যবস্থায় নির্বাচনী রাজনীতিতে কালো টাকা ফিরে আসবে। কিন্তু নির্বাচনী বন্ড চালু হওয়ার পরেও ২০১৩-তে কংগ্রেসের চালু করা ইলেক্টোরাল ট্রাস্টের মাধ্যমে বিজেপি প্রতি বছর টাকা নিয়েছে। ২০১৪-২৩ পর্যন্ত যত টাকা রাজনৈতিক দলগুলির কাছে গেছে তার ৭৬ শতাংশ পেয়েছে বিজেপি। ট্রাস্টের টাকা যদি কালো হয়, তাঁরা তা নিলেন কেন?

নির্বাচনী বন্ড চালু থাকার সময়েই ২০২০-২১-এ প্রুডেন্ট ইলেক্টোরাল ট্রাস্ট ২৪৫ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা রাজনৈতিক দলকে দিয়েছে, তার মধ্যে বিজেপি পেয়েছে ২০৯ কোটি টাকা। বাকি ৩৬ কোটি টাকা গেছে জেডিইউ, এনসিপি, কংগ্রেস, আরজেডি, আপ এবং এলজেপি-র কাছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছে ১৮টি ইলেক্টোরাল ট্রাস্ট নথিভুক্ত হলেও সিংহভাগ চাঁদা লেনদেন প্রুডেন্ট ট্রাস্টের মাধ্যমেই হয়েছে। এতে ৯০ শতাংশ টাকা ঢেলেছে মাত্র ১০টি বৃহৎ কর্পোরেট কোম্পানি। ২০২২-২৩-এ ট্রাস্টের মাধ্যমে পার্টিগুলো পেয়েছে মোট ৩৬৬ কোটি, বিজেপি একা পেয়েছে ২৫৯ কোটি টাকা (দ্য ওয়্যার ৫.০১.২৪)।

ছয়ের পাতায় দেখুন

অরণ্য ধ্বংসের ছাড়পত্র কর্পোরেটকে

একের পাতার পর

পুঁজিমালিকরা করে না। এর ওপর বর্তমান আইনটি কর্পোরেট কোম্পানিকে যথেচ্ছ বন-পরিবেশ ধ্বংস করার অবাধ ছাড়পত্র দিয়েছে। এর সরাসরি কুফল বর্তাচ্ছে বনভূমি সংলগ্ন অঞ্চলের দরিদ্র মানুষের জীবনে।

বিজেপি সরকার এবং একচেটিয়া মালিকদের সুচতুর পরিকল্পনা বোঝা যায় এর পরবর্তী কয়েকটি ঘটনায়। এই বিল পাশ হওয়ার পনেরো দিনের মধ্যে ওড়িশার রায়গড়া জেলার সিজিমালি পাহাড়ে বেদান্ত গোষ্ঠী বনভূমির দখল নিতে যায়। রায়গড়া ও কালাহান্ডি জেলার কুত্রুমালি পাহাড়ে আদানি গোষ্ঠীও একইভাবে বনভূমির দখল নিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। অবশ্য এখানে গ্রামবাসীরা তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। প্রতিবাদী আদিবাসী যুবকদের উপর পুলিশ অত্যাচার করে এবং তাদের বিরুদ্ধে নানা জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা দায়ের করে। এই দুটি প্রকল্প গড়ে তুলতে ১৮০টি গ্রামের প্রায় দুই লক্ষ আদিবাসী মানুষকে তাদের ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ হতে হবে।

এর আগে অরণ্যের অধিকারের জন্য আদিবাসী, চিরাচরিত বনবাসী মানুষের দীর্ঘ লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে অর্জিত হয়েছিল অরণ্যের অধিকার আইন-২০০৬। সেই আইনকে নস্যাৎ করে দেওয়ার জন্য বিজেপি সরকার অত্যন্ত চতুর এক পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে এগিয়েছে। প্রথমে ২০২২-এর জুন মাসে 'বন সংরক্ষণ রুল'-এর সাহায্যে গ্রাম সভার অধিকারকে এড়িয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করে। অরণ্যের অধিকার আইন অর্জিত হওয়ার পিছনে আদিবাসী, চিরাচরিত বনবাসী জনগোষ্ঠীর সুদীর্ঘ ঐতিহাসিক সংগ্রামের অবদান আছে। ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে চলেছে একের পর এক বিদ্রোহ। রাজমহল এলাকায় পাহাড়িয়া বিদ্রোহ, ভাগলপুরে তিলকা মাঝির নেতৃত্বে বিদ্রোহ, জঙ্গলমহলে চুয়াড় বিদ্রোহ, ভূমিজ বিদ্রোহ, ছোটনাগপুরে কোল বিদ্রোহ, সিংভূমে হো বিদ্রোহ, সাঁওতাল পরগণায় সিধু-কানুর নেতৃত্বে হুল-বিদ্রোহ, ছোটনাগপুর এলাকা জুড়ে বিরসা মুন্ডার নেতৃত্বে গড়ে ওঠা উলগুলান প্রভৃতি ঐতিহাসিক লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে অদিবাসীরা এবং জঙ্গল সংলগ্ন এলাকার অধিবাসীরা সামান্য কিছু হলেও অধিকার ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে আদায় করেছিল। স্বাধীনতার পর থেকেও নানা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তাঁদের যেতে হয়েছে। অবশেষে ২০০৬-এ অরণ্যের অধিকার আইনে সামান্য হলেও কিছু অধিকার তাঁরা অর্জন করেছিলেন। বিজেপি সরকারের নয়া আইন তা আবার কেড়ে নিল।

কোনও সরকারই আদিবাসীদের জঙ্গলের ন্যায্য অধিকার দেয়নি

এ দেশের প্রায় ২০ কোটি মানুষ জীবনধারণের জন্য জঙ্গলের উপর নির্ভরশীল। ঐতিহাসিকভাবে ইংরেজ শাসনের আগে জঙ্গল ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীগুলি পরম্পরাগতভাবে জঙ্গলের অধিকার নিয়ন্ত্রণ করতেন। এর মধ্যে ১০ কোটির বেশি আদিবাসী ও অন্যান্য জনগোষ্ঠীর মানুষের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল জঙ্গলকে ঘিরে গড়ে উঠেছে। জঙ্গলের উপর নির্ভরশীলতা তাঁদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রার অঙ্গ। এই সমস্ত জনগোষ্ঠী কোনওদিন জঙ্গলের ক্ষতি তো করেনি, বরং জঙ্গলকে তারা প্রাণ দিয়ে রক্ষা করে চলেছে। যদিও ব্রিটিশ থেকে শুরু করে স্বাধীন ভারতে কংগ্রেস বা বিজেপি সরকার সকলেই জঙ্গল রক্ষার নামে এদের উচ্ছেদ করেছে। না হলে জঙ্গলকে শোষণ করে ব্যবসায়িক লাভ তোলা বৃহৎ পুঁজিমালিকদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। তাই স্বাধীনতার ৭৫ বছর পরেও আদিবাসী ও চিরাচরিত বনবাসী মানুষ দেশের জনগণের সবচেয়ে গরিব ও পিছিয়ে পড়া অংশ।

১৯৫২ সালে কংগ্রেস সরকারের জঙ্গল নীতি প্রথম জঙ্গলের উপর জনসাধারণের অধিকার কেড়ে নিয়ে রাষ্ট্রের একচ্ছত্র অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। ১৯৭২-এর ওয়াইল্ড লাইফ প্রোটেকশন অ্যাক্ট বন্যপ্রাণ রক্ষার দোহাই দিয়ে জঙ্গলের উপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীগুলির পরম্পরাগত জীবন-জীবিকার জন্য জঙ্গলের উপর অধিকারের বিষয়টি গুরুত্বহীন করে দেয়। এর পর একের পর এক আইন এনে রাজ্যে রাজ্যে ব্যাপক উচ্ছেদ অভিযান চলে। অনন্যোপায় পাহাড় জঙ্গলের অধিবাসী দরিদ্র মানুষের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ফলে ২০০৩ সালে গঠিত প্রাক্তন বিচারপতি বিএন কৃপালের নেতৃত্বে 'ন্যাশনাল ফরেস্ট কমিশন'-এর সুপারিশেই অবশেষে 'অরণ্যের অধিকার আইন-২০০৬' তৈরি হয়। এর ফলে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধিকার অর্জিত হয়।

আইনে বলা হয়, ১৩ নভেম্বর ২০০৫ অবধি যারা জঙ্গলের জমিতে বসবাস করছেন বা জঙ্গলের জমি চাষাবাদ করে জীবন জীবিকা নির্বাহ করছেন তাদের ওই জমির পাট্টা দেওয়া হবে। এত লড়াই আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে এই গুরুত্বপূর্ণ আইনটি প্রণয়নের পরেও কেন্দ্র কিংবা বিভিন্ন রাজ্যের সরকার তা কার্যকরী করেনি। এমনকি পশ্চিমবঙ্গের সিপিএম পরিচালিত 'বামফ্রন্ট' সরকার এরপর পাঁচ বছর ক্ষমতায় ছিল। ত্রিপুরাতে ছিল আরও কয়েক বছর। তারাও এই আইন প্রয়োগ করে বনবাসীদের জমির পাট্টা দেওয়ার ব্যবস্থা করেনি।

পাট্টা পাওয়াকে অসম্ভব করে তুলেছে বিজেপি সরকার

বিজেপি ২০১৪-তে কেন্দ্রীয় ক্ষমতায় বসেই অরণ্যের অধিকার আইনের নতুন রুল এনে এমন শর্ত জুড়ে দিয়েছে, জমির পাট্টা পেতে হলে তিন প্রজন্ম ধরে বসবাসের প্রমাণ দিতে হবে। তিন প্রজন্ম মানে ৭৫ বছর। এই নথি আদিবাসী, চিরাচরিত বনবাসী দরিদ্র মানুষ পাবেন কোথায়? অধিকাংশ পরিবারকে সরকারি নথি দেওয়াই হয়নি। শিক্ষা বঞ্চিত, আইনকানুন সম্পর্কে ধারণাহীন এই মানুষগুলির পক্ষে এই নথি জোগাড় করা বাস্তবে অসম্ভব। আর একটি আক্রমণ সরকার এনেছে আদালতের মাধ্যমে। কেন্দ্রীয় সরকারের আবেদনক্রমে ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি অরুণ মিশ্রের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ যে নির্দেশ দেন তার ফলে ১৬টি রাজ্যের ১১ লক্ষ ২৭ হাজার ৪৪৬টি আদিবাসী ও বনবাসী পরিবার তাদের ভিটেমাটি হারাবে। (সূত্রঃ আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৯/০২/২০১৯)

গড়ে উঠছে প্রতিরোধ

গ্লোবাল ফরেস্ট ওয়াচ-এর সাম্প্রতিক রিপোর্টে প্রকাশ, ২০০০ সাল থেকে মাত্র তিন বছরের মধ্যেই বৃক্ষহীন হয়েছে ভারতের ২৩ লক্ষ ৩০ হাজার হেক্টর জমি (বর্তমান,১৪এপ্রিল'২৪)। আশার কথা, এই জনবিরোধী সরকারি নীতির বলে সরকারি বা বেসরকারি সংস্থা, যারাই জঙ্গলের দখল নিতে যাচ্ছে— আদিবাসী, বনবাসী ও গরিব শোষিত মানুষ প্রতিবাদে সোচ্চার হচ্ছেন, প্রতিরোধ গড়ে তুলেছেন। পরিবেশ সচেতন নাগরিক সমাজও এই সকল আন্দোলনকে সমর্থন করছেন, সর্বতোভাবে সাহায্য করছেন। গড়ে উঠেছে অল ইন্ডিয়া জন অধিকার সুরক্ষা কমিটি।

ইতিপূর্বে ওড়িশার সিমলিপালে উচ্ছেদবিরোধী আন্দোলন হয়েছে। লাদাখে পাহাড় ও পরিবেশ বাঁচানোর দাবিতে ধারাবাহিকভাবে আন্দোলন চলছে। ঝাড়খণ্ডের হাজারিবাগ জেলার বড়কাগাঁও, ছত্তিশগড়, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাত, আসামে উচ্ছেদবিরোধী আন্দোলন গড়ে উঠেছে। পশ্চিমবঙ্গের বীরভূমে দেউচা পাঁচামিতে খোলামুখ কয়লা খনির প্রতিবাদে এবং উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ ও যথাযথ পুনর্বাসনের দাবিতে আন্দোলন গড়ে উঠেছে। পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়ে ড্যাম তৈরি বা ইকোট্যুরিজম-এর নামে কিছু মানুষের আমোদ-ফূর্তির জন্য উচ্ছেদ করছে হাজার হাজার পরিবারকে। যারা এই উচ্ছেদের নায়ক, তারাই ত্রাতা সেজে এদের কাছে ভোট চাইতে আসছে।

অরণ্যের জনসাধারণের অধিকার রক্ষার আন্দোলন ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার আন্দোলন পরস্পরের পরিপূরক। এই আন্দোলনের কণ্ঠকে লোকসভার অভ্যন্তরে ধ্বনিত করতে প্রয়োজন সঠিক রাজনৈতিক শক্তির। যে সমস্ত রাজনৈতিক দল পুঁজিমালিকদের সেবাদাস হিসাবে তাদের রাজনৈতিক ম্যানেজারের ভূমিকা পালন করে, তারাই এই উচ্ছেদের হোতা। মানুষের অধিকারকে রক্ষা করতে পারে একমাত্র গণআন্দোলন ও বিপ্লবী বামপন্থার শক্তি। যে শক্তিটি হল এসইউসিআই (কমিউনিস্ট)। এই দল নির্বাচনী প্রচারের মধ্যেও বনাঞ্চলের মানুষের সমস্যা তুলে ধরে পাশে থাকার শুধু প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে না, প্রত্যক্ষভাবে আন্দোলন গড়ে তুলছে।

জীবনাবসান

দক্ষিণ ২৪ পরগণায় শিক্ষা ও শিক্ষক আন্দোলনের বিশিষ্ট সংগঠক এবং এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের কাকদ্বীপ লোকাল কমিটির প্রবীণ সদস্য 'মাস্টারমশাই' কমরেড সুধীরচন্দ্র বেতাল ২৪ মার্চ সকালে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ জনিত সমস্যায় কাকদ্বীপ হাসপাতালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৯৭ বছর।

সত্তরের দশকে এস ইউ সি আই (সি)-র সংস্পর্শে আসার পর থেকে দলের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা প্রতিটি আন্দোলনে তিনি সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহণ করতেন। ১৯৮৭ সালে তিনি দলের সদস্যপদ অর্জন করেন।

কমরেড সুধীরচন্দ্র বেতাল কাকদ্বীপ থানার অন্তর্গত সূর্যনগর অঞ্চলের সীতারামপুরে এক সচ্ছল পরিবারের সন্তান ছিলেন। শৈশবে দক্ষিণপন্থী রাজনীতিতে যুক্ত থাকাকালীন এক ঘটনায় তিনি কারারুদ্ধ হন। সেই সময় বর্ধমান জেলার দুর্গাপুরের কয়েকজন এস ইউ সি আই (সি) কর্মীও ওই জেলে বন্দি ছিলেন। তাঁদের মাধ্যমে তিনি কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার সংস্পর্শে আসেন। কারামুক্তির পর শিক্ষকতা করার পাশাপাশি পারিবারিক সূত্রে পাওয়া সমাজসেবামুখী মানসিকতাকে শোষণমুক্তির লক্ষ্যে নিয়োজিত করার জন্য দলের তৎকালীন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও জেলা সম্পাদক কমরেড ইয়াকুব পৈলানের সাথে জয়নগর অফিসে দেখা করেন। এরপর তিনি দলীয় কাজে যুক্ত হন এবং সংগঠন বিস্তারে উদ্যোগী হন। পরবর্তী কালে কাকদ্বীপ শহরে থেকে সংগঠন করার জন্য দলের অন্যান্য কর্মীদের সঙ্গে একত্রে বসবাস শুরু করেন। প্রথম শ্রেণি থেকে ইংরেজি ও পাশ-ফেল চালুর আন্দোলনে তিনি ছিলেন সক্রিয় কর্মী। প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদ পরিচালিত বৃত্তি পরীক্ষা পরিচালনায় এক সময় কাকদ্বীপ, সাগরদ্বীপ, নামখানার বিভিন্ন ব্লকে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন। নির্বাচনী কাজে পাথরপ্রতিমার বিভিন্ন জায়গায় এমনকি আসামেও দলের নেতৃত্বে কাজ করতে ঘরবাড়ি ছেড়ে তিনি দীর্ঘ সময় থেকেছেন। কাকদ্বীপ এলাকার বাসভাড়া বৃদ্ধিবিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা নেওয়ায় গ্রেপ্তার হয়ে হাজতে থেকেছেন। কমরেড বেতাল প্রাথমিক শিক্ষক সংগঠন বিপিটিএ-র জেলা কমিটির সদস্য ছিলেন। মৃত্যুর কয়েকদিন আগেও কলকাতায় অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকদের ধরনা মঞ্চে অংশগ্রহণ করেছেন। প্রচারবিমুখ, দল-অন্তঃপ্রাণ এই মানুষটি দলের জন্য সর্বস্ব দেওয়ার আন্তরিক চেষ্টা করেছেন। কাকদ্বীপে বসবাসকালীন নিজের সঞ্চিত টাকায় কেনা বাস্তুজমি ও গড়ে তোলা বসতবাটি দ্বিধাহীন চিত্তে দলের কাজের জন্য দিয়ে গেছেন। বার্ধক্যকে উপেক্ষা করেই দলের মুখপত্র বাড়ি বাড়ি দেওয়া, মিটিং-মিছিলে থাকার মতো কাজ নিয়মিত করতেন। পাশাপাশি স্কুল প্রতিষ্ঠা, দুর্গত মানুষের পাশে থাকার মতো সামাজিক কাজে সর্বদা নিজস্ব উদ্যোগে সচেষ্ট ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে দল হারাল একজন দল-অন্তঃপ্রাণ কর্মীকে। ৭ এপ্রিল কাকদ্বীপ শিশু শিক্ষায়তন স্কুলে তাঁর স্মরণে সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচক ছিলেন দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড নন্দ কুণ্ডু, রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড মাদার লস্কর। সভাপতিত্ব করেন কাকদ্বীপ লোকাল কমিটির সম্পাদক কমরেড অমিয় শাসমল। সভায় উপস্থিত ছিলেন দলের রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড জীবন দাস, কাকদ্বীপ সাংগঠনিক জেলা সম্পাদক কমরেড সুজিত পাত্র এবং স্থানীয় বিধায়ক মন্টুরাম পাখিরা সহ শহরের বিশিষ্টজনেরা।

কমরেড সুধীরচন্দ্র বেতাল লাল সেলাম

রাজনীতিতে নীতি-আদর্শ না থাকলে
কু-কথাই সম্বল

বিজেপি'র প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ সম্প্রতি লোকসভা নির্বাচনের প্রচারে গিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সম্পর্কে যে কদর্য মন্তব্য করেছেন, তাকে 'নজিরবিহীন' বলা গেলে ভালো হত। কিন্তু কঠিন বাস্তব হল, শাসক ও বিরোধী দলের নেতানেত্রীদের এরকম ভুরি ভুরি উক্তি রয়েছে। ভোট কেনাবেচা এবং দল-বদলের মতোই বিশেষত ভোটের আগে নেতা-নেত্রীরা একে অপরের দিকে কুকথা ছুঁড়ে দেওয়ার প্রতিযোগিতায় নামবেন, এও যেন ভোটের রাজনীতিতে খানিকটা স্বাভাবিকতায় পর্যবসিত হয়েছে। দিলীপ ঘোষের মতো 'রত্ন'রা মাঝেমধ্যেই এরকম বিতর্কিত মন্তব্য করাটাকে হয়তো নতুন করে সংবাদ শিরোনামে উঠে আসার সহজ পথও ঠাউরেছেন। বড় বড় দলগুলোর নীতিহীনতা, চুরি-দুর্নীতি, পরস্পরের প্রতি কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি, গদি দখলের জন্য যে কোনও অনৈতিক পথ অবলম্বন করা তো আজ প্রায় রোজকার ঘটনা। তাও এই সবকিছুর সাথে কোনও মহিলার প্রতি অশালীন মন্তব্য বা ইঙ্গিত করার যে গুণগত তফাতটুকু ছিল, দিলীপ ঘোষরা সেটুকুও মুছে ফেলে রাজনীতির মর্যাদা একেবারে মাটিতে মিশিয়ে দিতে একেবারে বদ্ধপরিকর। বিজেপি দলটির সাম্প্রতিক এবং অতীত ইতিহাসে বিরোধীদের সম্পর্কে, একটি বিশেষ সংখ্যালঘু ধর্মের মানুষ সম্পর্কে কদর্য, অসংবেদনশীল মন্তব্যের উদাহরণ কষ্ট করে খুঁজতে হয় না। কিন্তু এ জিনিস বিজেপি দলটির একক সম্পত্তি, এমন কথাও বলা যাচ্ছে না।

বিগত কয়েক দশকে শুধু এ রাজ্যের রাজনৈতিক ঘটনাক্রমে চোখ রাখলে, মহিলা সহ সমাজের বিভিন্ন অংশের প্রতি, বিরোধীদের প্রতি বিভিন্ন দলের নেতাদের কুৎসিত মন্তব্যের তালিকা খুব ছোট হবে না। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও নানা সময় বিজেপি নেতাদের লক্ষ্য করে কুকথা বলতে ছাড়েননি। নব্বই সালে বাসভাড়া বিরোধী আন্দোলনের ময়দানে এসইউসিআই(সি) কর্মী আঠেরো বছরের মাধাই হালদারের গুলিবিদ্ধ রক্তাক্ত দেহ যখন পড়ে আছে, তখন 'নিরামিষ আন্দোলনকে আমিষ করে দিলাম' বলে চূড়ান্ত অসংবেদনশীলতার পরিচয় দিয়েছিলেন বামফ্রন্ট সরকারের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু। ২০১১ তে সিপিএম নেতা অনিল বসু তৎকালীন বিরোধী নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে আজকের দিলীপ ঘোষের সুরেই নোংরা ইঙ্গিত করেছিলেন। পরে তিনি ক্ষমা চান, যেমন এই ভোটের বাজারে দিলীপ ঘোষকে লোকদেখানো তিরস্কার করতে বাধ্য হয়েছে তাঁর দল। কিন্তু ভেবে দেখা দরকার, কোনও কথা মুখ থেকে বেরোনোর আগে তৈরি হয় মনে। যে মন মহিলাদের সম্পর্কে এমন অশালীন কথা ভাবতে পারে, বিরোধীদের জব্দ করার জন্য যে কোনও অন্যায়কে যে মন মান্যতা দেয়, ক্ষমা চাওয়া বা দুঃখপ্রকাশ দিয়ে তার পচন আড়াল করা যাবে কি? যে রাজনীতি এমন মানসিকতাকে প্রশ্রয় দেয়, তার কদর্যতাও তো দিনের আলোর মতোই পরিষ্কার।

এক সময় সমাজের সবচেয়ে বেশি সংবেদনশীল মানুষরা রাজনীতিতে আসতেন। ক্ষুদিরাম বসু, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, ভগৎ সিং, মাস্টারদা সূর্য সেন, বিনয়-বাদল-দীনেশ, গান্ধীজী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস এঁরা ছিলেন দেশের রাজনৈতিক চরিত্র। মত ও পথের পার্থক্য থাকলেও রাজনীতিতে সেদিন একটা সৌজন্য-সহবত এর জায়গা ছিল, রাজনীতির মানুষরা ছিলেন সাধারণের শ্রদ্ধার পাত্র। পরবর্তীকালে বৃটিশের জায়গায় ক্ষমতা দখল করল দেশের পুঁজিমালিকরা। ক্ষমতায় বসা রাজনৈতিক দলগুলো বছরের পর বছর গদিতে বসে দেশসেবার নামে এই পুঁজির দাসত্বই করে যাচ্ছে। এই পুঁজির শাসন ও শোষণ টিকিয়ে রাখার পথে প্রধান অন্তরায় হল মানুষের মনুষ্যত্ব, যুক্তিবোধ, উন্নত সংস্কৃতি, প্রতিবাদ করার মানসিকতা। তাই কংগ্রেস, বিজেপি, তৃণমূল, সিপিএম সহ এইসব ভোটসর্বস্ব দলগুলোর অভ্যন্তরে রুচি সংস্কৃতি, নীতি আদর্শের বালাই একেবারে উঠে গেছে। সমাজ পরিসরে এবং রাজনীতিতে আজ মূল্যবোধের এক বিরাট শূন্যতা, নৈতিকতার ধস।

বিশিষ্ট মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক, এসইউসিআই(কমিউনিস্ট) দলের প্রতিষ্ঠাতা শিবদাস ঘোষ বলেছিলেন, কোনও রাজনৈতিক আদর্শ সত্যিই উন্নত কিনা, মহৎ কিনা তা চেনা যায় ওই রাজনীতির সাথে যুক্ত মানুষগুলোর নৈতিক চরিত্র, রুচি-সংস্কৃতির উন্নত মান দিয়ে। রাজনীতি উচ্চ হৃদয়বৃত্তি, বিপ্লবী রাজনীতি উচ্চতর হৃদয়বৃত্তি। তাঁর এই শিক্ষা বুকে নিয়েই এসইউসিআই(কমিউনিস্ট) দলের কর্মীদের গড়ে ওঠা। এই দলের কর্মীদের নিষ্ঠা, সততা, রুচিবোধ দেখে মানুষ বিস্মিত হন, ভালোবাসেন। আবার অনেকে হতাশার সুরে বলেন, 'আপনারা ঠিকই বলছেন, তবে এখন দিন বদলে গেছে, আজকাল আর নীতি-আদর্শের কথা মানুষ শুনতে চায় না।' দিনকাল কেন বা কীভাবে এমন বদলে গেল, রাজনীতির মূল স্রোত থেকে নীতি আদর্শের চর্চা কেন হারিয়ে গেল, জীবন-যুদ্ধে জেরবার মানুষ অতশত ভেবে দেখেন না। আর এই ভেবে না দেখার মাশুল সাধারণ মানুষকেই চোকাতে হয়, বারবার হতাশ, বীতশ্রদ্ধ হতে হয়। রাজনীতি খারাপ এই দোহাই দিয়ে যারা রাজনীতি থেকে দূরে থাকতে চান, তাঁদের নিষ্ক্রিয়তা, নীরবতাও পরোক্ষে এই নীতিহীন রাজনীতির বাড়বাড়ন্তকেই প্রশ্রয় দেয়। তাই আজ যারা রাজনীতিতে সৌজন্য, রুচিবোধ, সুস্থতা সত্যিই দেখতে চান, তাঁদের বুঝতে হবে, শুধু দিলীপ ঘোষদের নিন্দা করাই যথেষ্ট নয়। মূল্যবোধ-আদর্শের এই সংকটের যুগে, কলুষিত রাজনীতির ভিড়ে উজ্জ্বল আলোকবর্তিকার মতো একমাত্র যে দলটি নীতি-আদর্শভিত্তিক রাজনীতির পতাকা বহন করে গণআন্দোলনের ময়দানে লড়ছে, সেই এসইউসিআই(কমিউনিস্ট) দলের বিপ্লবী রাজনীতিকে শক্তিশালী করাই একমাত্র পথ।

বিজেপির কি হঠাৎ মনে পড়ল বিচারবিভাগের স্বাধীনতা বিপন্ন!

সম্প্রতি ৬০০ জনেরও বেশি আইনজীবীর প্রধান বিচারপতিকে লেখা একটি চিঠি অনেককে চমকে দিয়েছিল। তাঁরা বিচারব্যবস্থার সুনাম রক্ষার্থে সক্রিয় পদক্ষেপ করার জন্য প্রধান বিচারপতিকে অনুরোধ করেছেন। গণতন্ত্রের এক স্তম্ভস্বরূপ বিচার ব্যবস্থার সংহতি বজায় রাখতে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন, বিচারবিভাগের অখণ্ডতাকে ক্ষুণ্ণ করতে সচেষ্ট স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর সম্পর্কে উদ্বেগও তাঁরা প্রকাশ করেছেন। চিঠিতে বলা হয়েছে, স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী তাদের রাজনৈতিক অ্যাজেন্ডার উপর ভিত্তি করে আদালতের সিদ্ধান্তের একপেশে সমালোচনা বা প্রশংসা করে। 'বেঞ্চ ফিক্সিং'-এর অভিযোগ করে, এমনকি বিচারকদের সরাসরি আক্রমণও করে। তলিয়ে না দেখলে অনেকেরই মনে হতে পারে, তবে কি বিজেপি আমলে বিচারব্যবস্থার উপর সরকারের নিয়ন্ত্রণের চেষ্টার যে অভিযোগ উঠছে এই আইনজীবীরা তার প্রতিকার চাইছেন?

কিন্তু পত্রলেখকদের পরিচয় জানলে বোঝা যায় ব্যাপারটা এত সরল নয়। বিশেষত যে বিজেপি সরকার বিচারব্যবস্থার স্বাধীনতায় বারবার আঘাত করছে, সেই সরকারের প্রধানমন্ত্রী যখন এই চিঠি নিয়ে আগ বাড়িয়ে তাঁর সমর্থনসূচক মন্তব্য ছড়িয়ে দেন, তখন ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতেই হয়! এই আইনজীবীদের মধ্যে রয়েছেন হরিশ সালভে, আদিশ আগরওয়ালা, পিঙ্কি আনন্দ প্রমুখ। হরিশ সালভে বিজেপির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত এবং হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টে সরকার পক্ষে মামলা লড়েন। গত বছর লন্ডনে তাঁর তৃতীয় বিয়ের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ললিত মোদী এবং বিজয় মাল্যের মতো পলাতক ব্যক্তিরা। নির্বাচনী বন্ড মামলায় তিনি ছিলেন এসবিআই-এর আইনজীবী। তিনি প্রবল চেষ্টা করেছিলেন যাতে বন্ড প্রাপকদের তালিকা প্রকাশিত না হয়।

আদিশ আগরওয়ালা হলেন নরেন্দ্র মোদির জীবনীর সহ-লেখক। তিনি সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি যিনি নির্বাচনী বন্ড বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের রায় নাকচ করার জন্য ভারতের রাষ্ট্রপতিকে চিঠি লিখেছিলেন এবং তাঁর এই কাজকে সুপ্রিম কোর্ট বারের কার্যনির্বাহী কমিটি নিন্দা করেছিল।

পিঙ্কি আনন্দ ২০০৭ থেকে ২০১০ পর্যন্ত বিজেপির আইনি সেলের জাতীয় আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি বিজেপির সর্বভারতীয় জাতীয় কার্যনির্বাহী সদস্য ছিলেন। সুতরাং এটা স্পষ্ট যে, চিঠিটির পিছনে বিজেপির মাথা আছে। ঘটনাপ্রবাহ বলে, এটা লেখা হয়েছে সুপ্রিম কোর্টের ওপর চাপ সৃষ্টির জন্যই। বিশেষত নির্বাচনী বন্ড নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের রায় বিজেপিকে বিপাকে ফেলার পরেই এই চিঠির লেখকদের পরিচয় জানলে এই সন্দেহটাই গাঢ় হয়। বিজেপির উদ্বেগ হল, নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ এবং সিএএ-র মতো আরও অনেক রায় এখনও সুপ্রিম কোর্টে বিবেচনাধীন রয়েছে। নির্বাচনের আগে যে কোনও বিরূপ রায় বেরোলে অবশ্যই তা প্রধানমন্ত্রী মোদির ভাবমূর্তিকে প্রভাবিত করবে।

প্রশ্ন জাগে, বিজেপিপন্থী আইনজীবীরা কি রূপকথার 'রিপভ্যান উইংকল'-এর মতো দীর্ঘ ঘুম থেকে উঠে হঠাৎ দেখলেন, বিচারব্যবস্থার ওপর চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে? তাঁরা কি ভুলে গেলেন যে, ২০১৮ সালের জানুয়ারিতে সুপ্রিম কোর্টের চার বিচারপতি দিল্লিতে সাংবাদিক সম্মেলন করে ভারতের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্রকে অভিযুক্ত করেছিলেন বিশেষ বিশেষ মামলা, বিশেষ বিশেষ সুবিধাজনক বেঞ্চে পাঠানোর জন্য। ইঙ্গিত ছিল সরকারি ক্ষমতাকে খুশি করার জন্য এমনটা করা হতে পারে— সে দিকেই।

উল্লেখ্য, বিচারপতি দীপক মিশ্র অবসর নেওয়ার পরেই তাঁকে মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান হিসাবে নিযুক্ত করা হয়। রঞ্জন গগৈ, যিনি আইন, সংবিধানের ওপরে বিশ্বাসকে স্থান দিয়ে বাবরি মসজিদের জায়গায় রাম মন্দির নির্মাণে রায় দেওয়ার বেঞ্চেও নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, অবসর নেওয়ার পরে তাঁকে রাজ্যসভার সদস্যপদ দেওয়া হয়েছিল। বিচারপতি এস আব্দুল নাজির, যিনি রাম মন্দির রায় সংক্রান্ত বেঞ্চের অংশ ছিলেন, তাঁকে অবসরের পরেই অন্ধ্রপ্রদেশের রাজ্যপালও করা হয়েছিল। এ রকম 'ভালো কাজের পুরস্কার'-এর আরও অনেক উদাহরণ আছে। সালভে মহাশয়রা এ সব উদাহরণ জানেন না তা নয়। তাঁরা নিশ্চয়ই জানেন ইতিমধ্যেই বহু বিশিষ্ট আইনবিদ, প্রাক্তন বিচারপতি এর থেকে বিচারব্যবস্থাকে মুক্ত করার জন্য বহুবার মুখ খুলেছেন।

আলোচ্য চিঠির উদ্দেশ্য আরও প্রকট হয়ে যায় ২৬ জানুয়ারি ইউটিউবে পোস্ট করা সুপ্রিম কোর্টের একজন বিশিষ্ট আইনজীবী দুষ্মন্ত দাভের সাক্ষাৎকারটি শুনলে, যা সুপ্রিম কোর্টের ভিতরের ছবিটা প্রকাশ করে। তাঁর উত্থাপিত প্রশ্নগুলির উত্তর আজও পাওয়া যায়নি। ওই ৬০০ জন আইনজীবী বলতে চেয়েছেন, তথাকথিত বিভিন্ন গোষ্ঠীর অযাচিত চাপের কারণে সুপ্রিম কোর্ট ন্যায়সঙ্গত আচরণ করছে না। অথচ ভারতীয় বিচারব্যবস্থা সম্বন্ধে এতটুকু খোঁজ রাখা যে কোনও মানুষ বলবেন, আসলে বিচারব্যবস্থাকে সরকারের তাঁবেদার করতে চাইছে কারা? বিচারপতি নিয়োগ নিয়ে কলেজিয়ামের সুপারিশকে বারবার পাল্টানোর জন্য চাপ দেওয়া, সরকারের অপছন্দের বিচারপতিদের ট্রান্সফার করার জন্য চাপ সৃষ্টি, অপছন্দের বিচারপতিদের প্রমোশন আটকানো ইত্যাদি কাজে বিজেপি সরকার কংগ্রেসের থেকেও বেশি দক্ষতা অর্জন করেছে! এ কথা ঠিক, বুর্জোয়া ব্যবস্থারই অন্যতম স্তম্ভ বিচারব্যবস্থার ওপরই শুধু নির্ভর করে থাকলে আজকের দিনে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা করার কোনও গ্যারান্টি থাকে না। বিচারব্যবস্থাকেও অন্তত আপাত নিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক রাখতে গেলে জনগণের সচেতন সংঘবদ্ধ গণআন্দোলন এবং আন্দোলনমুখী পরিবেশ দেশে প্রয়োজন। না হলে বুর্জোয়া রাষ্ট্রের বিচারব্যবস্থা কখনও কখনও জনগণের পক্ষে রায় দিলেও তার ধারাবাহিকতা থাকে না। জনগণের সক্রিয়তাই মূল শক্তি।

রাজ্য জুড়ে চলছে দলের নির্বাচনী প্রচার

চূড়ান্ত দুর্নীতিবাজ বিজেপি, তৃণমূল কংগ্রেস ও সুবিধাবাদী সিপিএম-কংগ্রেস জোটকে পরাস্ত করতে এবং বিপ্লবী বামপন্থাকে শক্তিশালী করতে রাজ্যের ৪২টি লোকসভা কেন্দ্রে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) প্রার্থীদের জয়ী করার আহ্বান জানিয়ে সর্বত্র জনসংযোগ ও প্রচার চলছে

বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রে মিছিল

বীরভূম ও বোলপুর কেন্দ্রে দলের প্রার্থী কমরেড আয়েষা খাতুন ও কমরেড বিজয় দলুই-এর সমর্থনে প্রচার মিছিল

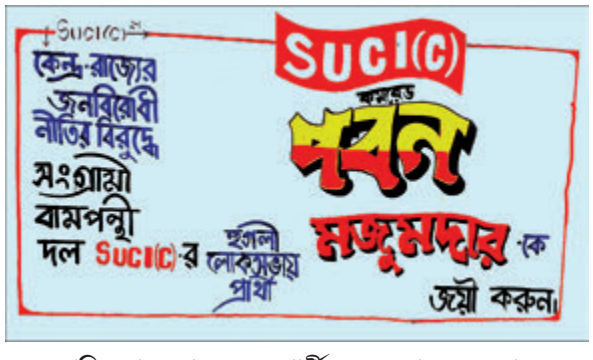

হুগলি লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী কমরেড পবন মজুমদারের সমর্থনে দেওয়াল লিখন

মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার পথে ঘাটাল লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী কমরেড দীনেশ মেইকাপ

এতই যদি আর্থিক বৃদ্ধি তবে মানুষের এত দুর্দশা কেন?

প্রধানমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী থেকে বিজেপির আইটি সেল সবাই একযোগে ভারতীয় অর্থনীতির আয়তনে বিশ্বে পঞ্চম স্থান অধিকারের আখ্যানই ফলাও করে প্রচার করে চলেছে। কালো টাকা উদ্ধার করে, সকলের অ্যাকাউন্টে ১৫ লক্ষ টাকা দেওয়া প্রভৃতি পূর্ববর্তী 'জুমলা'গুলির মতোই বর্তমানে জি ২০-র সভাপতিত্বকে সামনে রেখে 'বিশ্বগুরু' হয়ে ওঠা বা প্রধানমন্ত্রীর দয়াতেই যে দেশের মানুষ খেতে পারছে তার প্রমাণ স্বরূপ ৩০০ কোটি টাকা খরচ করে প্রধানমন্ত্রীর মুখচ্ছবি সংবলিত ২০ কোটি ব্যাগ বিতরণ বা রেশন দোকানের সামনে প্রধানমন্ত্রীর বড় কাটআউট লাগানো প্রভৃতি পদক্ষেপও চলছে জোরকদমে। তথ্য বলছে, ২০১৮-১৯ সাল থেকে ২০২৪-এর জানুয়ারি পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীর বিজ্ঞাপনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ৩০০০ কোটি টাকারও বেশি খরচ করেছে। প্রচারের ঢক্কানিনাদ যত তীব্রই হোক দেশের বাস্তব চিত্র কিন্তু সম্পূর্ণ উল্টো। আসলে অর্থব্যবস্থার তত্ত্বগুলি সাধারণ মানুষের বোধগম্য না হওয়ার সুযোগেই তথ্যের মারপ্যাঁচ ঘটিয়ে একটা মেকি বাস্তবতাকে খাড়া করার প্রচেষ্টা অনায়াসে চালিয়ে যাচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার। মোদিজি যতই বিশ্বগুরু হতে চান না কেন, জি-২০ গোষ্ঠীভুক্ত কুড়িটি দেশের মধ্যে সর্বনিম্ন মাথাপিছু গড় আয় ভারতেরই। আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডারের হিসাব অনুযায়ী ২০২৩ সালে বিশ্বের ১৯৫টি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান ১৪৩তম। আর্থিক বৃদ্ধির হার নিয়ে নেতারা হুঙ্কার দিচ্ছেন অথচ শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে সরকারের ব্যয় কণামাত্র। মূল্যবৃদ্ধি ও বেকারত্ব আকাশছোঁয়া। ২০২১-২২ সালে দেশের মোট আভ্যন্তরীণ উৎপাদনে বিনিয়োগের পরিমাণ ৩৫ শতাংশ থেকে কমে ২০২৩ সালে হয়েছে ৩০ শতাংশ। জাতীয় নমুনা সমীক্ষা সংস্থার কনজিউমার এক্সপেন্ডিচার বা ভোগব্যয় গ্রামাঞ্চলে নিম্নমুখী এবং নরেন্দ্র মোদির সময়কালেই দেশের আর্থিক বৃদ্ধি সর্বনিম্ন— এই তথ্যগুলি কিন্তু সিংহভাগ জনগণের অজানা। ফলে প্রধানমন্ত্রী যখন প্রতিদিন দেশের সার্বিক উন্নয়নের কথা বলছেন বা 'গরিবি দূরীকরণের' স্লোগান দিয়ে বলছেন 'উন্নয়নই তাঁর অগ্রাধিকার, তখন উন্নয়নের প্রকৃত সুফল কারা পাচ্ছে? অন্তত সাধারণ মানুষ সামান্যতমও পাচ্ছেন না, এটা দিবালোকের মতো সত্য।

ভারতের আর্থিক বৃদ্ধি নিয়ে সম্প্রতি উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ওয়ার্ল্ড ইকনমিক ফোরাম। মনে রাখা দরকার যে এই ফোরাম কিন্তু মূলত পুঁজিবাদী বাজারপন্থী ও খোলা ধনতন্ত্রে বিশ্বাসী। অথচ এই ফোরামই অসমান বৃদ্ধি নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করতে বাধ্য হয়েছে। দেখা যাচ্ছে আয়ের নিরিখে যারা উপরের দিকে রয়েছে সেই কম সংখ্যক মানুষেরই আয় বেড়েছে, নিচের দিকে থাকা মানুষের বেশিরভাগেরই কোনও আয় বাড়েনি বরং কমেছে। এই দ্বিতীয় প্রবণতাটি বর্তমানে দেশের প্রধান ধারা। ফলে যখন কেন্দ্রীয় সরকার একটি সমীক্ষা রিপোর্ট প্রকাশ করে দাবি করছে যে পূর্ববর্তী ১০ বছরের তুলনায় ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে দেশের পরিবারগুলির মাসিক খরচ বৃদ্ধি পেয়েছে বা দাবি করছে যে দেশের দারিদ্রের হার কমে ৫ শতাংশে নেমেছে, তখন আর্থিকভাবে এগিয়ে থাকা মানুষের তুলনায় আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা অংশের আর্থিক পার্থক্য সমাজে প্রকটতর হচ্ছে। তা ওয়ার্ল্ড ইকনমিক ফোরামের প্রকাশিত রিপোর্টে প্রমাণিত। আবার সরকারের রিপোর্টে কতগুলো অসঙ্গতি সাধারণ মানুষের ধরাছোঁয়ার বাইরেই থেকে গেছে। প্রথমত, যে নীতি আয়োগ সম্প্রতি বহুমাত্রিক দারিদ্র সূচকের রিপোর্টে বলেছিল ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে দেশের দরিদ্র মানুষের হার ১১.২৮ শতাংশ, সেই নীতি আয়োগের সিইও বি ভি আর সুব্রহ্মানিয়ম কিছুদিনের মধ্যেই দারিদ্রের হার কমে ৫ শতাংশ নেমেছে বলে যে রিপোর্ট প্রকাশ করলেন তার পিছনে কোন জাদুমন্ত্র কাজ করছে তা দেশের মানুষের অজানা। দ্বিতীয়ত, যে সমীক্ষার রিপোর্ট প্রতি পাঁচ বছর অন্তর প্রকাশিত হওয়ার কথা তা ২০১৭-১৮ অর্থবর্ষে কেন্দ্রীয় সরকার প্রকাশ করেনি। পরবর্তী সময়ে যখন এই রিপোর্ট ফাঁস হয়ে যায় তখন স্পষ্ট হয় যে, নোটবন্দি ও জিএসটি চালুর ফলে ওই সময় মানুষের খরচের ক্ষমতা চার দশকের মধ্যে ছিল সর্বনিম্ন। মূল্যবৃদ্ধি যে ঊর্ধ্বমুখী এবং গ্রামাঞ্চলে প্রকৃত ভোগব্যয় যে নিম্নমুখী সেটাও উক্ত রিপোর্টে সামনে আসে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান মন্ত্রকের অধীনে থাকা ন্যাশনাল স্যাম্পেল সার্ভে অফিসের পরিসংখ্যান থেকে উঠে এসেছে, আর্থিকভাবে এগিয়ে থাকা মানুষের ভোগব্যয় কিছুটা বাড়লেও পিছিয়ে থাকা মানুষের ক্ষেত্রে তা ক্রমাগত কমেছে। ওই রিপোর্টেই দেখা যাচ্ছে, যখন আর্থিকভাবে নিচের দিকে থাকা ৫ শতাংশ গ্রামীণ মানুষের মাসিক খরচ ১৩৭০ টাকা এবং শহরের ক্ষেত্রে ২০০১ টাকা মাত্র, তখন উপরের দিকে থাকা ৫ শতাংশ গ্রামীণ মানুষের মাসিক ব্যয় ১০,৫০১ টাকা এবং শহরের ক্ষেত্রে ২০,৮২৪ টাকা। অর্থাৎ ওয়ার্ল্ড ইকনমিক ফোরামের আশঙ্কাই সত্য। সরকার যতই তথ্যের মারপ্যাঁচ করুক না কেন এই সত্য দেশের অর্থনীতিতে ক্রিয়াশীল। দেশের জিডিপি বাড়ছে বলে যখন এত লাফালাফি হচ্ছে তখনও নিচের দিকে থাকা মানুষগুলির কোনও আর্থিক উন্নতি ঘটেনি।

তাই প্রধানমন্ত্রী যখন জনগণের সামনে উন্নয়নের স্বপ্ন ফেরি করে বেড়াচ্ছেন বা দেশের ২৫ কোটি মানুষ দারিদ্রসীমার উপরে উঠে এসেছে বলে দাবি করছেন তখন দেশের প্রকৃত আর্থিক দুরবস্থা নিয়ে অবশ্যই প্রশ্ন উঠবে।

কোনও শিল্প-কলকারখানা গড়ে তোলা বা ব্যাপক সংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করার ব্যাপারে পূর্বতন কংগ্রেস সরকারের মতোই বর্তমান বিজেপি সরকারও সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ। পরিবর্তে দেশের অসমান আর্থিক বৃদ্ধির সুফল মালিক শ্রেণির কাছে যাচ্ছে, তাদের কর বা ঋণ সমস্তই মকুব করে দিয়ে মূল্যবৃদ্ধি ও করের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে সাধারণ মানুষের উপর।

দেশের এই ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক অসাম্যের মূলে রয়েছে বর্তমান পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে উৎপাদনের উপর ব্যক্তিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠিত করার মধ্য দিয়ে। এই ব্যবস্থাই দেশের এক শতাংশ পুঁজিপতি শ্রেণিকে সমস্ত সম্পদের মালিক করে তুলেছে। সে কারণেই করোনা অতিমারিতে সমগ্র দেশ যখন বিপন্ন, মানুষ আশ্রয়-চিকিৎসা ও খাদ্যের জন্য হাহাকার করছে তখন দেশের ৩০০ জন শিল্পপতি নতুন করে বিলিয়নেয়ার হয়ে গেছে। শ্রমিককে তার শ্রমের ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত করার মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন বেড়েছে মালিকের মুনাফা, অন্য দিকে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা ক্রমাগত তলানিতে এসে ঠেকেছে। এই অবস্থায় বাজারে কার্যকরী চাহিদা না থাকায় উৎপাদনে লগ্নি হওয়ার পরিবর্তে পুঁজির লগ্নি হচ্ছে শেয়ার বাজার বা রিয়েল এস্টেটের মতো ক্ষেত্রগুলিতে। আর এই শেয়ার বাজার চাঙ্গা হওয়াকে যে আর্থিক বৃদ্ধি বলে দেখানো হচ্ছে তার সাথে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বা ভোগব্যয় বৃদ্ধি হওয়ার কোনও সম্পর্ক নেই। যাকে বৃদ্ধি বলে দেখানো হচ্ছে তাও অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী। এই বৃদ্ধিটা বুদবুদের মতো মাঝে মাঝে ফুলে উঠলেও পরক্ষণেই তা ফেটে যায়— শুরু হয় মন্দা।

ফলে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা না বাড়লে, নতুন কর্মসংস্থান তৈরি না হলে, খয়রাতি নয়— স্থায়ী কাজ পাওয়ার মধ্য দিয়ে দেশের বেকার সমস্যার সমাধান না ঘটাতে পারলে, সর্বোপরি বর্তমান উৎপাদন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করে নতুন উৎপাদন ব্যবস্থা চালু করতে না পারলে এই অসাম্যকে দূর করা মালিক শ্রেণির পদলেহনকারী কোনও নেতা, কোনও অর্থনীতিবিদ বা কোনও সরকারের পক্ষেই সম্ভব নয়। প্রধানমন্ত্রী নিজেও তা জানেন। যে একচেটিয়া পুঁজি মালিকদের তিনি সেবাদাস তাদের স্বার্থেই তাঁকে চলতে হয়, কাজ করতে হয়। সেজন্য মিথ্যার আশ্রয় ছাড়া তাঁর আর পথ কী!

রাজ্যে রাজ্যে নির্বাচনী প্রচার

হরিয়ানার ভিওয়ানি-মহেন্দ্রগড় লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী কমরেড রোহতাস সৈনীর কর্মীসভা

মনোনয়ন জমা দেওয়ার পর ছত্তিশগড়ের রায়পুর কেন্দ্রের প্রার্থী কমরেড বিশ্বজিৎ হারোড়ে

জনগণের সঙ্গে কেরালার কোঝিকোড় কেন্দ্রের প্রার্থী কমরেড ডাঃ এম জ্যোতিরাজ

সুসজ্জিত মিছিল সহ মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার পথে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) -এর বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী কমরেড অভিজিৎ মণ্ডল

মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্র ও ভগবানগোলা বিধানসভা উপনির্বাচনে দলের প্রার্থী যথাক্রমে কমরেড মাহাফুজুল আলম ও কমরেড ওমর খৈয়ামের প্রচার

বুঝি বলেই তো দ্বন্দ্বটা বেশি!

হাতিবাগানের পিছনের যে গলিতে বেশ কয়েকটা চায়ের দোকান রয়েছে তা সারাদিনই থাকে জমজমাট। অনেকে বলে উত্তর কলকাতার ডেকার্স লেন। সকাল বেলা সেখানকার আড্ডা মানে টিভির সংবাদ চ্যানেল। সব মতের মানুষের সমাবেশ। কাল কোথায় কী ঘটেছে, কে কী বলেছে, সব কিছুর একেবারে লাইভ রিপোর্ট। সেই আড্ডার অন্যতম সদস্য সুমন্তদা। অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী। ছাত্রাবস্থা থেকেই রাজনীতির সঙ্গে জড়িত।

সে দিন আড্ডায় সুমন্তদাকে একটু চুপচাপ দেখে জিজ্ঞেস করলাম, কী সুমন্তদা শরীর ঠিক আছে তো? বললেন, না রে শরীর ঠিকই আছে। মেজাজটা ভাল নেই। বললাম, কেন, কারও কিছু ঘটেনি তো? প্রচারে বের হচ্ছেন না?

বললেন, আর প্রচার? কোন মুখে বেরোব? কোন মুখে গিয়ে মানুষকে বলব— কংগ্রেসকে ভোট দিন?

বললেন, কাগজে দেখেছিস তো, দল কংগ্রেসের সঙ্গে জোট করছে। আমি বললাম, দেখেছি।

বললেন, শোনার পর থেকে নিজেকে আর ঠিক রাখতে পারছি না। বললেন, দেখ, তোরা তো জানিস, আমাদের বামপন্থী পরিবার। বাবা-কাকারা সবাই ছিলেন দলের সক্রিয় কর্মী। বাহাত্তরে দীর্ঘদিন বাড়িছাড়া। শেষ পর্যন্ত কাকা খুন হয়ে গেলেন। আমাকেও অফিসে কম হেনস্থা হতে হয়নি। বললেন, এই তো পাশেই বরানগর। বরানগর হত্যাকাণ্ড মানুষ কি ভুলে গেছে! এখনও খুঁজলে ১১০০ কর্মী খুনের পুরনো দেওয়াল লিখন পাওয়া যাবে।

“এর পরে কি আর আমরা বামপন্থী দল হিসেবে দাবি করতে পারব! নেতারা দক্ষিণপন্থা বামপন্থার পার্থক্যটুকুও আর রাখলেন না! মানুষের কাছে কোন মুখে গিয়ে দাঁড়াব! নিজের বামপন্থী পরিচয় তো আমি ত্যাগ করতে পারব না।”

কথাগুলি এক নিঃশ্বাসে বলে গেলেন। আমি চুপ করেই থাকলাম। আবার বলতে শুরু করলেন, দেখ, সেই পাঁচের দশকের গোড়া থেকে কংগ্রেসের নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করেই তো বামপন্থীদের উত্থান। সেই আন্দোলনে সব বামপন্থী দল ছিল। তারপরে আমরা সরকারে এলাম। সেই সরকারের প্রথম প্রায় এক দশক তো কেন্দ্রের কংগ্রেসি সরকারের বঞ্চনাই ছিল দলের মূল স্লোগান। সারা জীবন কংগ্রেসের বিরুদ্ধতা করে এসে এখন সেই কংগ্রেসকে বন্ধু বলে জনগণের মধ্যে প্রচারই বা কী করে করব? আর করলেও জনগণ কি তা বিশ্বাস করবে?

সুরজিৎ কখন পাশে এসে বসেছে খেয়াল করিনি। এক সময়ে ছাত্র সংগঠন করত। এখন কোন একটা সংবাদ চ্যানেলে কাজ করে। হঠাৎ সে বলে উঠল, সুমন্তদা, শুধু তো কংগ্রেস নয়, আইএসএফের মতো একটা দলের সঙ্গে জোটের যে চেষ্টা, তাই কি মানা যায়?

সুমন্তদা বললেন, ভাবতেই পারছি না যে, নেতারা শেষ পর্যন্ত আইএসএফের সঙ্গেও জোট করতে নামবেন। যতই সেকুলার বলা হোক, সত্যিটা যে কী, তা তো সবাই জানে। এ তো বামপন্থাকেই বিসর্জন দেওয়া! এর পরে কি আর আমরা বামপন্থী দল হিসেবে দাবি করতে পারব! নেতারা দক্ষিণপন্থা বামপন্থার পার্থক্যটুকুও আর রাখলেন না! মানুষের কাছে কোন মুখে গিয়ে দাঁড়াব! নিজের বামপন্থী পরিচয় তো আমি ত্যাগ করতে পারব না।

বললেন, দ্যাখ তোদের দল তো বামপন্থার ঝান্ডা নিয়ে একাই লড়ছে। আমি তো বলেছিলাম, কংগ্রেসের সঙ্গে কেন? কেন তোদের সঙ্গে নয়? সেটাই তো সবচেয়ে ভাল হত। এ তো শোষিত মানুষের মধ্যে শুধু বিভ্রান্তিই ছড়াবে।

সুরজিৎ বলে উঠল, সুমন্তদা, দল যা-ই ঠিক করুক, আমাকে মেরে ফেললেও কংগ্রেসকে ভোট দিতে পারব না। আচ্ছা সুমন্তদা, তোমার সঙ্গে তো নেতাদের পরিচয় রয়েছে। তুমি কেন প্রতিবাদ করলে না?

বললেন, জোনাল নেতাদের সাথে এ নিয়ে অনেক তর্ক করেছি। তাঁরা বলেন, কিছুই নাকি তাঁদের করার নেই। সব ওপর তলার সিদ্ধান্ত।

সুরজিৎ বলল, এমন সিদ্ধান্ত না-ই মানলাম সুমন্তদা।

বুঝলাম, সুরজিতের মধ্যেও একই দ্বন্দ্ব কাজ করছে।

সুমন্তদা বললেন, দ্যাখ, নেতৃত্বকে কখনও অমান্য করিনি। আর কখনও করতে হবে তা-ও ভাবিনি।

আমি বললাম, সুমন্তদা তোমার কী মনে হয়— দল কেন এমন একটা জোটে যাচ্ছে, যা তোমার মতো দলের পুরনো কর্মীরাও মানতে পারছে না।

বললেন, শুধু আমি তো নই, সক্রিয় বহু কর্মী— এই তো সুমন, রঞ্জন, অমলদা— সবাই কত ভাল কর্মী ছিল, কেউই মানতে পারছে না। কতজন চুপচাপ বসে গেছে। অথচ দু-একটা সিট ছাড়া এমন জোটের অন্য কিছু কারণ তো আমি অন্তত খুঁজে পাচ্ছি না।

বললাম, তুমি তো বামপন্থী সুমন্তদা। তোমার কাছে দলের স্বার্থের থেকে শোষিত মানুষের স্বার্থ বড়। তুমি যদি নিশ্চিত হও যে, দল ভুল রাস্তায় যাচ্ছে এবং তাতে বামপন্থী আন্দোলনেরই ক্ষতি হবে, শোষিত মানুষের বাঁচার আন্দোলন পিছিয়ে পড়বে, তবে তুমি তা মানবে কেন? তুমি সত্যের পক্ষে, শোষিত মানুষের পক্ষে বলেই বামপন্থী হয়েছো, কোনও ফ্যাশন থেকে তো হওনি।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, বুঝি রে! আর বুঝি বলেই দ্বন্দ্বটা আরও বেশি। যাই হোক, বাড়িতে আসিস।

পাঠকের মতামত

‘বোকা’ ঋক ও বর্তমান সমাজ

ঘটনাটা বহু আলোচিত। বীরভূমের লাভপুরে তৃতীয় শ্রেণির ছাত্র ঋক বাগদি বড় হয়ে বোকা হতে চেয়েছে। আসলে সে চেয়েছে তার বাবার মতো সৎ হতে।

এ সমাজ ঋককে আর কিছু না শেখাক, একটা কথা ছোট থেকে শেখাতে চেয়েছে— ‘সৎ মানে বোকা’। যেমন ধরুন, আজকের ভোট রাজনীতিতে যদি কোনও রাজনৈতিক দল কিংবা প্রার্থী বলেন— আমি মিথ্যা চমক দিয়ে ভোট চাইব না। সত্যকে তুলে ধরব। অনেকেই বলবেন— কি বোকা! অথচ চালাক বলে যাদের তাঁরা ভোট দেন— সেই চালাকরা যে তাঁদেরই ঠকাবে এ কথা কি ভোটারদের অজানা? তবু এটাই দস্তুর। ঋক যেন তাই ব্যতিক্রম।

বর্তমানে লোকসভা ভোটের আবহে সমস্ত ক্ষমতাসীন দলের নেতা-নেত্রীরা যখন মানুষকে বোকা বানিয়েই ভোটযুদ্ধে জেতার মরিয়া চেষ্টা করছেন, তখন ঋকের ‘বোকা’ হতে চাওয়াটা আরও বেশি করে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। নীতিগত কোনও ফারাক না থাকলেও এক দলের বিরুদ্ধে আর এক দলের নেতা-নেত্রীদের ছদ্ম-হুঙ্কারে কান পাতা দায়। সারল্য, সততা, বিশ্বাস নামক গুণগুলি যখন এই সব নেতা-নেত্রীদের অভিধান থেকে বিদায় নিয়েছে, তখন এই গ্রাম্য ছেলেটি যে ভাবে সরল বিশ্বাসে সৎ থাকার অভিপ্রায় জানাল, তা একটা উদাহরণ।

চলমান সমাজব্যবস্থায় বহু মানুষই সরল সহজ মানুষকে বোকা ঠাওরায়, বলে ওর দ্বারা কিছু হবে না। যে কোনও উপায়ে, অপরকে ঠকিয়ে কিছু অর্জন করা ব্যক্তিকে যোগ্য মনে করে। লাভ-ক্ষতির ভিত্তিতে তাদের ভাল-মন্দ নির্ধারিত হয়। সেখানে বোকা হতে চাওয়া ঋকের কথা অনেকের মনে দাগ কাটতে না পারলেও আশার আলো দেখছেন অসংখ্য মানুষ— যাঁরা সমাজের রুচি-সংস্কৃতির নিম্নগামিতা দেখে আতঙ্কিত, যাঁরা সততা, মূল্যবোধ এগুলির অভাবকেই সমাজের নৈতিক অবক্ষয়ের জন্য দায়ী মনে করেন। যে বাবা-মা নিজ সন্তানকে ‘আপনি বাঁচলে বাপের নাম’, ‘চাচা আপন প্রাণ বাঁচা’-র শিক্ষায় শিক্ষিত করছেন তাঁরাও একটু ভেবে দেখলে বুঝতেন, যে যুবক-যুবতীরা আত্মকেন্দ্রিক জীবন যাপন করতেই অভ্যস্ত হয়ে উঠেছেন, জীবনের কোনও বাঁকে এসে তাদের মনও হয়ত বলে উঠবে— ঋকরাই ছিল ভাল, যারা জীবনে কখনও কাউকে ঠকানোর চেষ্টা করেনি, যারা পারস্পরিক বিশ্বাস ও সততার সেতুতে গড়ে ওঠা সুন্দর একটা সমাজ-জীবনের স্বপ্ন দেখেছিল।

কিন্তু ঋকের বোকা হতে চাওয়া অর্থাৎ সৎ থাকতে চাওয়া কি একেবারেই দুর্লভ? চারদিকে তাকিয়ে কি আমরা এমন কাউকে দেখতে পাই না, যাঁরা সৎভাবে জীবন যাপন করেন, নিজেদের আচার-আচরণের দ্বারা সততার নজির স্থাপন করেন জনমানসে? একটু চোখ মেলে তাকালেই আমাদের চারপাশে এমন অনেক মানুষকেই দেখতে পাওয়া যাবে।

বর্তমান রাজনীতির ক্ষেত্রেও প্রধান ধারাটি অসততা, মিথ্যাচার, দুর্নীতিপরায়ণতা, আস্ফালন প্রদর্শনের হলেও এর পাশাপাশি বিপরীত আর একটি ধারার অস্তিত্ব প্রবল ভাবেই রয়েছে সমাজে। সেটা হল সততা, নিষ্ঠা, একাগ্রতা আর নিপীড়িতের জন্য সংগ্রামের ধারা। যারা মানুষকে ঠকায় না, শোষণ করে না, লুণ্ঠন করে না, মানুষের মুক্তির জন্য লড়াই করে, প্রতারণার বিরুদ্ধে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করে, নির্বাচনেও তারা যে কোনও উপায়ে ভোট পাওয়ার কথা ভাবে না।

আসলে সমাজে বেশিরভাগ অসৎ, দুর্নীতিপরায়ণ, ঠগ লোকেদের মধ্যে মুষ্টিমেয় সৎ মানুষকে দেখলে মানুষ অবাক হন, ভাবেন এরা ব্যতিক্রম। তাঁরা ভুলে যান, ব্যতিক্রমটাই সমাজের প্রধান ধারা হওয়ার কথা। কিন্তু তা না হওয়ার কারণ খোঁজার চেষ্টা করেন না। শুধু ঋকের মতো কেউ কেউ যখন সততার কথা বলে, তখন তাঁরা খুশি হন। ঋকের এই সরল উক্তি যাদের মনে কিছুটা হলেও আশা জাগিয়েছে, নাড়া দিয়ে গেছে, তাদের বুঝতে হবে— সমাজ অভ্যন্তরে সততা, বিশ্বাসের ভিত্তিতে সুন্দর, সহজ-সরল, অনাবিল আনন্দের মধ্যে বেঁচে থাকার জন্য যে নতুন সমাজ গড়ে তোলার কাজটি ইতিমধ্যেই এগিয়ে চলেছে, তাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়াতেই একমাত্র তাঁদের স্বপ্ন সফল হতে পারে। তাই তাঁদের আজ সিদ্ধান্ত নিতে হবে— সেই শক্তিরই আরও বৃদ্ধিতে সাহায্য করবেন, নাকি বর্তমান সমাজের ঘুণ ধরা চেহারা দেখে হা-হুতাশ করে দিন কাটাবেন!

সংহতি বসু
কলকাতা-১৩

* * *

মোদিজি-ই জনগণের কাছে সত্য তুলে ধরেছেন!

দেশের অর্থনৈতিক বছর শেষের মাস অর্থাৎ মার্চ মাসের শেষ দিন ৩১ তারিখ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তাঁর দশ বৎসরের শাসন কালে এই প্রথম ‘ন্যাশনাল এক্সক্লুসিভ’-এ রাজনৈতিক প্রশ্নের উত্তর দিতে দিল্লি থেকে হাজির হয়েছিলেন তামিলনাড়ুর তানাথি টিভি লাইভে। দেশের রাজধানী দিল্লিতে তাবড় তাবড় ন্যাশনাল নিউজ চ্যানেলের স্টুডিও থাকা সত্ত্বেও হাজার কিলোমিটার দূরে তামিলনাড়ুর একটি আঞ্চলিক টিভিতে গিয়ে তিনি তাঁর প্রথম ন্যাশনাল এক্সক্লুসিভ করলেন কেন? এ প্রশ্ন ওঠা যুক্তিসঙ্গত হলেও দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তিনি যে কোনও যুক্তির ধার ধারেন না, তা তার এক ঘন্টার এই লাইফ এক্সক্লুসিভ দেখলেই বোঝা যায়। সাক্ষাৎকারের শেষ কুড়ি মিনিট উপস্থিত দু’জন সাংবাদিক প্রধানমন্ত্রীর কাছে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক প্রশ্ন রাখেন। যেমন, নির্বাচনী বন্ডের তথ্য প্রকাশ পাওয়ার পর বিজেপি দলের বিরুদ্ধে নানা প্রশ্ন উঠছে। এ নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য জানতে চাওয়া হয়। অনেকটা নায়কোচিত ভঙ্গিতে মোদিজি জানান যে, নির্বাচনী বন্ডের কিছু খামতি রয়েছে ঠিকই। কিন্তু এ সব নিয়ে আজ সবাই যে প্রশ্ন তুলতে পারছে তার ক্রেডিট আসলে মোদিজির নিজেরই। কারণ আগের কংগ্রেস সরকার সহ কোনও সরকারি দলই নির্বাচনী ফান্ডের এমন স্বচ্ছ তথ্য প্রকাশ করেনি, তারা সবাই জনগণকে ঠকিয়েছে।

অর্থাৎ মোদিজি বলছেন একমাত্র তিনিই জনগণের কাছে সত্য তুলে ধরেছেন! কিন্তু কী সেই সত্য? সত্যিই কি মোদিজি চেয়েছিলেন যে নির্বাচনী বন্ডের যাবতীয় তথ্য প্রকাশিত হোক? বরং ঘটনাক্রম ঠিক উল্টোটাই। নির্বাচনী বন্ডের বিরুদ্ধে প্রায় ৬ বছর ধরে কেস চলার পর গত ১৫ ফেব্রুয়ারি সুপ্রিম কোর্ট একে অসাংবিধানিক আখ্যা দেয় এবং এসবিআই-কে যাবতীয় তথ্য প্রকাশ করার নির্দেশ দেয়। কিন্তু দেশবাসী অবাক বিস্ময়ের সঙ্গে দেখেছে যে কী ভাবে সরকারি ব্যাঙ্ক এসবিআই তথ্য প্রকাশ করার ক্ষেত্রে চূড়ান্ত অসহযোগিতা করেছে ও নির্লজ্জ ভাবে সুপ্রিম কোর্টে দাঁড়িয়ে বন্ডের তথ্য ভোটের আগে প্রকাশ করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছে। মোদিজি হয়তো ভেবেছেন যে জনগণ বোকা, তাই সরকারি ব্যাঙ্কের এমন ভক্তসুলভ মনোভাবের পেছনে কী কারণ থাকতে পারে সে নিয়ে জনতার প্রশ্ন থাকবে না। তাই তিনি নির্দ্বিধায় একটা নির্জলা মিথ্যাকে চালিয়ে দিলেন। যেন তাঁর ইচ্ছেতেই নির্বাচনী বন্ডের যাবতীয় তথ্য প্রকাশ পেয়েছে! অর্থাৎ ডাবল ইঞ্জিন সরকারের সাথে কোন কোন লটারি কোম্পানি, কনস্ট্রাকশন কোম্পানি ও ওষুধ কোম্পানির কত টাকার লেনদেন হয়েছে সেই তথ্য প্রকাশিত হোক, এটা স্বয়ং মোদিজিই নাকি চেয়েছেন!

হয়তো মোদিজি ভেবেছেন এ দেশের আম জনতা নিরেট গবেট। না হলে প্রায় ৬ হাজার কোটি টাকা অর্থাৎ মোট নির্বাচনী বন্ডের পঞ্চাশ শতাংশ ঘুষ নিয়েছে যে বিজেপি দল তাকেই বা ভোট দিয়ে জেতাবে কোন আক্কেলে! তাই এক্সক্লুসিভ-এর প্রায় শেষের দিকে তিনি বলেছেন যে ২০২৪-এর লোকসভা ভোটে তিনি তৃতীয়বারের জন্য নিশ্চিত ভাবেই প্রধানমন্ত্রী হতে চলেছেন। কারণ জনতা জনার্দন ইতিমধ্যেই তাদের মনের মধ্যে তাঁকে গ্রহণ করেছেন। যে দেশের ৪০.৫ শতাংশ সম্পদের মালিক মাত্র ১ শতাংশ কোটিপতি (২০২১-এর অক্সফাম রিপোর্ট), যাদের কেনা ইলেক্টোরাল বন্ডের টাকায় মোদিজির লাখ টাকার জামা তৈরি হয়, যাদের দেওয়া চার্টার বিমানে তিনি তামিলনাড়ু গেলেন এবং যাদের দেওয়া শত শত কোটি টাকা খরচে প্রচারিত তাঁর নিজের ছবির বিজ্ঞাপনে তিনি মিশন ৪০০ টু ভিশন ২০৪৭-এর স্বপ্ন দেখছেন, সেই দেশের বাকি ৯৯ শতাংশ সাধারণ শ্রমজীবী জনতা কি তাঁর প্রিয় জনতা জনার্দন হতে পারে?

ডাঃ দীপক কুমার গিরি
বেলদা, পশ্চিম মেদিনীপুর

অন্য উপায়েও টাকা

একের পাতার পর

রিপোর্টার্স কালেক্টিভ জানাচ্ছে, প্রুডেন্টের মতো ইলেক্টোরাল ট্রাস্ট নির্বাচনী বন্ডেও ২২০০ কোটি টাকা ঢেলেছে, যার ৭২ শতাংশ পেয়েছে বিজেপি (দ্য রিপোর্টার্স কলেক্টিভ, ১৭.০৩.২৪)। **অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্রেটিক রিফর্মস (এডিআর)-এর হিসাব অনুযায়ী ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে কর্পোরেট কোম্পানিগুলো বন্ড ছাড়া অন্যপথে যত চাঁদা দিয়েছে তার ৯০ শতাংশ গেছে বিজেপির তহবিলে। তারা পেয়েছে ৬৮০.৪৯৫ কোটি টাকা। বাকি সব জাতীয় দল মিলে পেয়েছে ৭০ কোটির কিছু বেশি।**

কংগ্রেস পেয়েছে ৫৫.৬২৫ কোটি টাকা, আপ ১১ কোটি টাকা, সিপিএম ২ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকা। সিপিএম নির্বাচনী বন্ড থেকে কোনও টাকা না নিলেও ধারাবাহিকভাবে কর্পোরেট কোম্পানির থেকে টাকা নিয়েছে। ২০১৪-২০১৮ পর্যন্ত তারা কর্পোরেট থেকে পেয়েছে ৩ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা। ২০১৯-২০২২-এ নিয়েছে ৬.৯১৫ কোটি টাকা (অবজার্ভার রিসার্চ ফাউন্ডেশনের রিপোর্ট এবং বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড, ১০.০৪.২২)। ট্রাস্টের মাধ্যমে সবচেয়ে বেশি টাকা দিয়েছে— পরিকাঠামো তৈরির বিতর্কিত সংস্থা মেঘা ইঞ্জিনিয়ারিং, নানা দুর্নীতিতে অভিযুক্ত সান্টিয়াগো মার্টিনের লটারি কোম্পানি ফিউচার গেমিং, ভারতী এয়ারটেল, আরসেলার মিত্তল গোষ্ঠী (দ্য হিন্দু বিজনেস লাইন এবং টাইমস অফ ইন্ডিয়া ১৬.০৩.২৪) । **তৃণমূল কংগ্রেসও সান্টিয়াগো মার্টিনের লটারি কোম্পানি, গোয়েঙ্কাদের কোম্পানি ইত্যাদিদের নানা সুবিধা দানের চুক্তিতে ১৬১০ কোটি টাকা পেয়েছে বন্ড থেকে। অন্য পথেও তারা টাকা নিয়েছে।**

সান্টিয়াগো মার্টিনের থেকে ২ কোটি টাকা নিয়েছে কেরালার সিপিএম। সেই সময় (২০০৬-১১) ভিএস অচ্যুতানন্দনের সরকার অন্য লটারি কোম্পানির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছিল। যদিও তাদের দাবি বিতর্ক হওয়ার পর পরে তারা এই টাকা ফেরত দিয়েছে। উল্লেখ করা দরকার, এই বিতর্কিত লটারি মালিকের বিরুদ্ধে দুর্নীতির মামলায় তাঁর আইনজীবী হিসাবে কংগ্রেস নেতা অভিষেক মনু সিংঘভি যেমন দাঁড়িয়েছেন, তেমনই কেরালার সিপিএম সরকারের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়নের ঘনিষ্ঠ আইনজীবীও সান্টিয়াগোর হয়ে আদালতে দাঁড়িয়েছেন (ডেকান হেরাল্ড, ১৬.০৩.২৪)।

তিরবনন্তপুরমের আরএসপি নেতা শিবু বেবি জন নির্বাচন কমিশনের তথ্য তুলে দেখিয়েছেন, বন্ডের মাধ্যমে টাকা না নেওয়ার যতই গর্ব করুক সিপিএম, তারা বন্ডে টাকা ঢালা বিতর্কিত কোম্পানি মেঘা ইঞ্জিনিয়ারিং, নবযুগ ইঞ্জিনিয়ারিং, কাইটেক্স, মুথহুট, ডাঃ রেড্ডিস ল্যাবরেটরি, ন্যাটকো ফার্মা, আবগারি মামলায় অভিযুক্ত অরবিন্দ ফার্মা ইত্যাদি কর্পোরেট সংস্থা থেকে টাকা নিয়েছে (টাইমস অফ ইন্ডিয়া ৬.০৪.২৪)। ২০১৯-এ এডিআর রিপোর্ট জানিয়েছিল, কর্পোরেট ফান্ডিং থেকে সবচেয়ে বেশি (৯৮ শতাংশ) টাকা পেয়েছে বিজেপি, দ্বিতীয় কংগ্রেস, তৃতীয় স্থানে ছিল সিপিএম।

নারী উন্নয়ন শুধুই জুমলা

একের পাতার পর

হয়নি। এ বারের নির্বাচনী ইস্তেহারেও বিজেপি মহিলাদের ক্ষমতায়ন ও উন্নয়নের দেদার প্রতিশ্রুতি বিলিয়েছে। নারীদের আর্থিক স্বনির্ভরতা, চিকিৎসার সুযোগ, কর্মরত মহিলাদের জন্য হোস্টেল, ক্রেশ ইত্যাদির সংখ্যা এবং খেলাধূলায় তাদের যোগদান বৃদ্ধি করার 'মোদি কি গ্যারান্টি' ঘোষণা করেছে। শুনলে মনে হয়, বিশাল এই দেশের গ্রাম-শহরে ছড়িয়ে রয়েছে পড়াশোনার সুযোগবঞ্চিত, ঘোমটা-টানা, পিছিয়ে থাকা নারীসমাজের যে বিরাট অংশ, তাদের জীবনে আলো জ্বালতে গত দশ বছরের শাসনে বিপুল উদ্যোগে চেষ্টা চালিয়েছে বিজেপি সরকার। এক ঝলকে দেখে নেওয়া যাক এক দশকের বিজেপি শাসনে দেশের নারীসমাজের হাল কতটা ফিরেছে।

মহিলাদের উপর অপরাধের সংখ্যা বেড়ে চলেছে

সমাজে নারীরা কতখানি সুরক্ষিত, তা তাদের জীবনমান উন্নয়নের ছবিটিকে স্পষ্ট করে। ২০১৪ সালের ইস্তেহারে বিজেপি নারী-সুরক্ষার বেহাল দশার জন্য তৎকালীন ইউপিএ সরকারের অপদার্থতার প্রবল সমালোচনা করেছিল। ন্যাশনাল ক্রাইমস রেকর্ড বুরো (এনসিআরবি)-র রিপোর্ট অনুযায়ী সেই সময়ে ২০১২ সালে মহিলাদের উপর ঘটা অপরাধের সংখ্যা ছিল ২.৪৪ লক্ষ। ওই এনসিআরবি-র রিপোর্ট অনুযায়ী কেন্দ্রে বিজেপি সরকারের ৮ বছরের শাসনের পর ২০২২ সালে এই সংখ্যা পৌঁছেছে ৪.৪৫ লক্ষে। এর এক বছর আগে ২০২১ সালে এই সংখ্যা ছিল ৪.২৮ লক্ষ। দেশের মধ্যে আবার বিজেপি-শাসিত 'ডবল ইঞ্জিন সরকার'-এর উত্তরপ্রদেশে মহিলাদের উপর অত্যাচারের ঘটনা এই সময়ে ঘটেছে সবচেয়ে বেশি— ৬৫ হাজার ৭৪৩টি (সূত্র ঃ নিউজক্লিক, ৫ ডিসেম্বর, ২০২৩)। বিজেপি শাসিত মধ্যপ্রদেশ ও গুজরাটও এ বিষয়ে পিছিয়ে নেই। মধ্যপ্রদেশে শুধু ২০২২ সালে ৩ হাজার ৪৬টি ধর্ষণ-গণধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। গুজরাটেও মহিলাদের উপর হামলা, খুন, ধর্ষণ, গণধর্ষণের ঘটনা ক্রমশ বেড়ে চলেছে। বোঝাই যাচ্ছে, গোটা দেশ তো দূরের কথা, এমনকি যে রাজ্যগুলিতে বিজেপি নিজে সরকারে রয়েছে, সেখানেও মহিলাদের সুরক্ষা দিতে তারা ব্যর্থ।

ঝলমলে বিজ্ঞাপন বাদে লিঙ্গ-সমতা ও নারীশিক্ষা অন্ধকারেই

প্রথমবার সরকারে বসার পরেই ২০১৫ সালে প্রধানমন্ত্রীর 'বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও' প্রকল্পের বিজ্ঞাপনে ছেয়ে গিয়েছিল দেশ। নারী ও পুরুষ শিশুর সংখ্যায় সমতা আনা ছিল এই প্রকল্পের অন্যতম লক্ষ্য। সরকারি তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে বিপুল ঢাক-ঢোল পিটিয়ে প্রকল্পটির দেদার প্রচার সত্ত্বেও বাস্তবে ২০২২-'২৩ সালেও প্রতি ১ হাজারটি পুরুষ শিশুর তুলনায় দেশে শিশুকন্যার সংখ্যা মাত্র ৯৩৩টি। অর্থাৎ বেটি বাঁচানোর যে প্রতিশ্রুতি বিজেপি দিয়েছিল, দশ বছরের শাসন শেষে তার ব্যর্থতা স্পষ্ট।

শিশুকন্যাদের পড়াশোনার আওতায় আনার ক্ষেত্রে সরকারি তথ্য বলছে, ২০১৪-'১৫ সালে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষায় কন্যা-শিক্ষার্থী ৭৫.৫১ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০১৯-'২০-তে হয়েছে ৭৭.৮৩ শতাংশ। সামান্য হলেও বৃদ্ধি, সন্দেহ নেই। কিন্তু বিশেষজ্ঞদের মতে, দেশের সমস্ত এলাকা জুড়ে এই বৃদ্ধি সমান হারে হয়নি। তাঁদের আরও অভিযোগ, কন্যা সন্তানদের শিক্ষা নিয়ে বিজ্ঞাপনী প্রচারের ঘটা যতখানি দেখা গেছে, তার সামান্যও দেখা যায়নি গোটা বিষয়টি সম্পর্কে পরিকল্পনা ও তার রূপায়নে। তথ্য বলছে, ২০১৪ থেকে ২০২১-এ মোদি সরকার 'বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও' প্রকল্পের বিজ্ঞাপনেই শুধু খরচ করেছে মোট বরাদ্দের ৫৮ শতাংশ অর্থ! (সূত্র ঃ স্ক্রোল ডট ইন, ২৩ ফেব্রুয়ারি, '২৪)। কিন্তু হাথরস কাণ্ডে প্রমাণ লোপাটের জন্য ধর্ষিতার দেহ জ্বালিয়ে দেওয়া, জম্মু-কাশ্মীরের কাঠুয়ায় ধর্ষণকারীদের সমর্থনে বিজেপি বিধায়কদের মিছিলের মতো বীভৎস ঘটনা আড়াল করবে কোন বিজ্ঞাপন?

রুগ্নতাই সাথী ধুঁকতে থাকা নারীসমাজের

২০১৪-র নির্বাচনী ইস্তেহারে বিজেপি ঘোষণা করেছিল, তারা সরকারে এলে দেশের মহিলাদের স্বাস্থ্য-পরিস্থিতির উন্নয়নে অত্যন্ত গুরুত্ব দেবে। বিশেষ লক্ষ রাখা হবে গর্ভাবস্থায় মহিলাদের শারীরিক পুষ্টিতে। ২০১৯-এও তারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, নানা সরকারি প্রকল্পের মাধ্যমে মহিলাদের স্বাস্থ্যের প্রতি যত্ন নেবে বিজেপি সরকার।

দশ বছর ধরে কেন্দ্রে বিজেপি শাসনের পর কী দেখা যাচ্ছে? ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন (ডব্লিউএইচও)-র তথ্য বলছে, ভারতে প্রসবকালীন মৃত্যু হয় প্রতি ১ লক্ষে ১৭৪ জন প্রসূতি মায়ের, যা এশিয়ার বেশ কয়েকটি দেশের তুলনায় যথেষ্ট বেশি। রিপোর্ট অনুযায়ী ভারতের প্রায় ৫০ শতাংশ মহিলাই রক্তশূন্যতার শিকার। পরিণামে গর্ভাবস্থা ও সন্তান জন্মের সময় তাঁরা নানা অসুস্থতায় ভোগেন (সূত্র ঃ টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ২৯ মার্চ, '২৩)। ২০১৯-'২১-এর অন্য একটি সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, দেশের অধিকাংশ মহিলা অসুস্থ হলে উপেক্ষার শিকার হন। দেশের ৬০ শতাংশ মহিলাই উপযুক্ত চিকিৎসার সুযোগ পান না।

কাজের সুযোগ মেলে না মহিলাদের

কাজের বাজারে মহিলাদের অংশগ্রহণের হার বহু বছর ধরেই ভারতে অত্যন্ত কম। কিন্তু মোদি সরকারের গত দশ বছরের নয় বছরেই এই হার আরও কমেছে। ২০১২ সালে কাজের বাজারে মহিলাদের অংশগ্রহণের হার ছিল ২৭ শতাংশ। ২০২১-এ তা কমে দাঁড়ায় ২৩ শতাংশের কাছাকাছি। পরের বছর সামান্য বেড়ে এই হার হয় প্রায় ২৪ শতাংশ। যদিও বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই হার বৃদ্ধির পিছনে রয়েছে কৃষিকাজে ও স্বনিযুক্ত কাজে মেয়েদের বেশি করে অংশগ্রহণ, যা থেকে প্রায়ই কোনও মজুরি মেলে না।

মোদি সরকারের আমলে, বিশেষ করে কোভিড অতিমারির পর থেকে দেশের নানা ক্ষেত্রের মহিলা কর্মীরা চূড়ান্ত দুর্দশার মধ্যে কাজ করে চলেছেন। সংসার চালানোর দায়ে উপযুক্ত কাজের অভাবে আরও বেশি বেশি করে মহিলারা অসংগঠিত ক্ষেত্রের নানা কাজে সামিল হচ্ছেন। গৃহ-পরিচারিকা, দিনমজুর, আশা ও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী, ফুটপাথের ছোট দোকানদার, ফেরিওয়ালা ইত্যাদি অসংগঠিত ক্ষেত্রের কাজে যুক্ত মহিলারা

কী ভয়ানক নিরুপায়তায় সামান্য রোজগারের জন্য প্রতিদিন অমানুষিক পরিশ্রম করে চলেছেন, সকলেরই তা জানা। অথচ কেন্দ্রের মোদি সরকারের কোনও হেলদোল নেই। সরকারি কর্মীর স্বীকৃতি ও উপযুক্ত ভাতার দাবিতে আশা ও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা বছরের পর বছর ধরে আন্দোলন করে চলেছেন। 'নারীশক্তি'র মহিমা কীর্তনে ব্যস্ত মোদি সরকার মন্ত্রী-সাংসদদের মাইনে বাড়াতে ব্যস্ত হলেও এই বিপুল সংখ্যক নারী-কর্মীদের দুর্দশা দূর করার দিকে সামান্য নজর দিতে রাজি নয়।

মহিলাদের জন্য কল্যাণমূলক প্রকল্পেও হাত গোটাচ্ছে মোদি সরকার

দারিদ্রসীমার নিচে থাকা মহিলাদের জন্য জ্বালানি গ্যাস সরবরাহের প্রকল্প 'প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনা'-র বিজ্ঞাপনে এক সময়ে ছেয়ে গিয়েছিল শহর-গ্রাম-নগরের পথঘাট। কাঠকুটো জ্বেলে রান্না করতে গিয়ে ধোঁয়ার বিষে আক্রান্ত মহিলাদের জন্য প্রধানমন্ত্রীর প্রাণ নাকি কেঁদে উঠেছিল। তাই ২০২৩ সালে, সরকারি রিপোর্ট অনুযায়ী সাড়ে ৯ কোটিরও বেশি গ্যাস সিলিন্ডার তুলে দেওয়া হয়েছিল গরিব মহিলাদের হাতে, বিনা মূল্যে। কিন্তু ওই একবারই বিনা পয়সায় সিলিন্ডার পেয়েছিলেন তাঁরা। এরপর সরকারি রিপোর্টে দেখা গেল, প্রাপকদের প্রায় ৫৭ শতাংশই তাঁদের প্রাপ্য বছরে ১২টি গ্যাস সিলিন্ডার নিতে পারেননি টাকার অভাবে। কেউ একটা, কেউ খুব বেশি হলে দুটো বা তিনটে নিতে পেরেছেন, তার পর ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছেন আবার সেই কাঠকুটোর জ্বালানিতে।

শুধু উজ্জ্বলা যোজনাই বা কেন, অন্যান্য কল্যাণমূলক প্রকল্প যেখানে মহিলাদের অংশগ্রহণের হার বেশি, সেক্ষেত্রেও কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদি সরকারকে বাজেট বরাদ্দ ক্রমাগত কমিয়ে দিতে দেখা যাচ্ছে। এগুলির মধ্যে আছে একশো দিনের কাজ প্রকল্প, নারী-শিশুদের পুষ্টি ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত নানা সরকারি প্রকল্প। অতীতের সমস্ত রেকর্ড ভেঙে এগুলিতে বরাদ্দ কমিয়ে দিয়েছে মোদি সরকার।

বাস্তবে, যে আরএসএস-এর মতাদর্শে পরিচালিত হয় বিজেপি দলটি, তাদের চিন্তাধারায় নারী-পুরুষের সমতা স্বীকৃত নয়। তাঁরা মনে করেন, সমাজে নারীর স্থান পুরুষের পিছনে। ২০১৩ সালে আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত তো প্রকাশ্যেই বলেছিলেন, স্ত্রীর কর্তব্য ঘরকন্না দেখভাল করা এবং স্বামীর কাজ রোজগার করা। স্ত্রী যদি তার কর্তব্য না করে তা হলে স্বামীর অধিকার আছে তাকে পরিত্যাগ করার (সূত্র ঃ পিটিআই, ৬ জানুয়ারি, ২০১৩)। এই মোহন ভাগবতই আগে মন্তব্য করেছিলেন যে, পশ্চিমি অপসংস্কৃতির প্রভাবেই ধর্ষণের মতো ঘটনা ঘটে এবং ভারতের শহরাঞ্চলে ঘটলেও গ্রাম-ভারতে ধর্ষণ হয় না (সূত্র ঃ ওই)। ফলে ভাষণ দিতে গিয়ে স্বয়ং নরেন্দ্র মোদি ও তাঁর সহযোগীরা যা-ই বলুন, নির্বাচনী ইস্তেহারে সাধারণ মানুষকে ধোঁকা দিতে যা-ই লেখা হোক, বাস্তবে দেশের নারীসমাজের বড় অংশটা আজও যে অন্ধকারে ডুবে রয়েছে, তাদের আলোয় আনার উদ্যোগ নেওয়া, উজ্জ্বল জীবন উপহার দেওয়ার চেষ্টা চালানো বিজেপি সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ, এ তাদের নেতা-মন্ত্রীদের মানসিক গঠনের সঙ্গেই খাপ খায় না। তাই, ২০২৩-এর ২৮ মে, যেদিন নতুন সংসদ ভবনের উদ্বোধন উপলক্ষে বিশাল আয়োজন করেছিল মোদি সরকার, সেদিন সেই নতুন সংসদে মহা সমারোহে প্রধানমন্ত্রীর পাশে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি সাংসদ, ভারতের কুস্তি ফেডারেশনের সভাপতি, মহিলা কুস্তিগিরদের যৌন হেনস্থায় অভিযুক্ত ব্রিজভূষণ শরণ সিং। আর অলিম্পিক পদকজয়ী যে অত্যাচারিত কুস্তিগিররা ব্রিজভূষণের গ্রেফতারির দাবিতে সেই সময় দিল্লিতে আন্দোলন করছিলেন, দেশের মানুষকে হতবাক করে দিয়ে ওই দিনই বিজেপি সরকারের নির্দেশে পুলিশ তাঁদের টেনে-হিঁচড়ে চূড়ান্ত অশালীন ভাবে গ্রেফতার করেছিল। গুজরাট দাঙ্গায় বিলকিস বানোর ধর্ষক ও তার শিশুসন্তানের খুনীদের 'ভালো আচরণ'-এর সার্টিফিকেট দিয়ে জেলের বাইরে এনে রীতিমতো সংবর্ধনা দিয়েছিল এই বিজেপি।

শুধু এই নয়, আরও একটি ঘটনায় মহিলাদের প্রতি বিজেপি নেতাদের পিতৃতান্ত্রিক তাচ্ছিল্যপূর্ণ মানসিকতা প্রকট হয়। মণিপুর দীর্ঘদিন ধরেই মেইতেই-কুকি জাতিগত সংঘর্ষে উত্তপ্ত। ২০২৩-এর জুলাই মাসে প্রকাশ্যে আসে একটি কুৎসিত ঘটনা। জানা যায়, সেখানে দুই মহিলাকে নগ্ন করে এলাকায় ঘোরানো হয়েছে এবং সেই ঘটনার ভিডিও করে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। গোটা দেশ শুধু নয়, বিশ্বের নানা দেশেও এই ঘটনার তীব্র নিন্দা ছড়িয়ে পড়ে। হাজার হাজার মহিলা মণিপুরের বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদত্যাগ চেয়ে বিক্ষোভ দেখান। এত সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি একবারের জন্য মণিপুরে পা রাখেননি শুধু নয়, ওই জঘন্য ঘটনাটির নিন্দাসূচক একটি বাক্যও তাঁর মুখে শোনা যায়নি।

ফলে নরেন্দ্র মোদি ও তাঁর সাথীদের 'নারীশক্তি'-র উন্নয়নের জোর-গলা স্লোগানই হোক, কিংবা নির্বাচনী ইস্তেহারে মহিলাদের জন্য বড় বড় প্রতিশ্রুতিই হোক— দেশের নারীসমাজ কি এইসব জুমলায় ভুলবেন?

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2022-24

গণদাবী GANADABI Volume: 76, No.: 36 Bengali Weekly April 26, 2024 Kolkata Price: Rs. 3.00

রাজ্য কমিটির প্রবীণ সদস্য কমরেড প্রফুল্ল মণ্ডলের জীবনাবসান

এস ইউ সি আই (সি)-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির প্রবীণ সদস্য কমরেড প্রফুল্ল মণ্ডল ১৯ এপ্রিল বিকেলে ক্যালকাটা হার্ট ক্লিনিক অ্যান্ড হসপিটালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। কমরেড প্রফুল্ল মণ্ডল রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস সহ নানা রোগে আক্রান্ত ছিলেন।

তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় ১৫ এপ্রিল তাঁকে ক্যালকাটা হার্ট ক্লিনিক অ্যান্ড হসপিটালের আইটিইউতে ভর্তি করতে হয়। তাঁর নিউমোনিয়া এবং নিউট্রোপেনিক সেপসিস রোগ ধরা পড়ে। খ্যাতনামা চিকিৎসক প্রফেসর সুগত দাশগুপ্ত, ডাঃ শৈবাল ঘোষ, ডাঃ আলোকেন্দু ঘোষ, ডাঃ শান্তনু বসু সহ হাসপাতালের ক্রিটিক্যাল কেয়ার টিমের চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে তাঁর চিকিৎসা চলে।

সর্বোচ্চ চিকিৎসা সত্ত্বেও তাঁর শারীরিক অবস্থা খুবই সঙ্কটজনক হয়ে মাল্টি অর্গান ফেলিওর শুরু হয়। ১৯ এপ্রিল সকালে অক্সিজেনের মাত্রা খুব কম হয়ে যাওয়ায় তাঁকে ভেন্টিলেশনে দিতে হয়। বেলা ৩ টা ২৫ মিনিটে তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বিপ্লবী জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে দলের রাজ্য অফিস সহ পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জেলা এবং আঞ্চলিক অফিসে দলের রক্তপতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়। কর্মীরা কালো ব্যাজ ধারণ করেন।

কমরেড প্রফুল্ল মণ্ডলের মরদেহ পরদিন সকাল ৮টায় রাজ্য অফিসে শেষ শ্রদ্ধা জানানোর উদ্দেশ্যে আনা হয়। রাজ্য অফিসে দলের সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষের পক্ষে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান পলিটবুরো সদস্য কমরেড স্বপন ঘোষ এবং প্রবীণ পলিটবুরো সদস্য কমরেড অসিত ভট্টাচার্যের পক্ষে মাল্যদান করেন পলিটবুরো সদস্য কমরেড সৌমেন বসু। এ ছাড়াও উপস্থিত কেন্দ্রীয় কমিটি ও রাজ্য কমিটির সদস্যরা মাল্যদান করেন। রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড সুব্রত বিশ্বাসের নেতৃত্বে মরদেহ দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার জয়নগর অফিসে পৌঁছলে রাজ্য সম্পাদক, পলিটবুরো সদস্য কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য এবং জেলা নেতৃত্ব মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান।

কমরেড প্রফুল্ল মণ্ডল লাল সেলাম

দুর্নীতিগ্রস্তদের শাস্তি ও যোগ্য চাকরিরতদের বহাল রাখার দাবি এস ইউ সি আই (সি)-র

কলকাতা হাইকোর্ট ২২ এপ্রিল এসএসসি মামলার রায়ে ২০১৬ সালের নিয়োগ প্যানেল সম্পূর্ণ বাতিল করার যে নির্দেশ দিয়েছে তার প্রেক্ষিতে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য এ দিন এক বিবৃতিতে বলেন,

নবম, দশম, একাদশ, দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক এবং গ্রুপ সি, গ্রুপ ডি কর্মীপদে ২৫,৭৫৩ জনের চাকরি বাতিল সংক্রান্ত রায়ে রাজ্য সরকারের নিয়োগ দুর্নীতির বহরটি সকলের সামনে পরিষ্কার হয়েছে। দুর্নীতির মাধ্যমে যাঁরা চাকরি পেয়েছেন তাঁদের দুর্নীতি সমর্থন করার প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু ২০১৬-র প্যানেলে এমন অনেকেই আছেন যাঁরা যোগ্যতার বলে চাকুরি পেয়েছেন। কোন আইন ও যৌক্তিকতায় তাঁদেরও চাকরি খোয়াতে হবে তা বোধগম্য নয়। এটা ন্যায়বিচারের পরিপন্থী। এই দুর্নীতির সঙ্গে শাসক দলের ও এসএসসি-র যাঁরা যুক্ত তাঁদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানানোর পাশাপাশি যোগ্যতার মাপকাঠিতে যাঁরা নিযুক্ত হয়েছিলেন আমরা তাঁদের চাকরি বহাল রাখার ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি করছি। অন্য দিকে বঞ্চিত চাকরি প্রার্থীদের দ্রুত নিয়োগের দাবি জানাচ্ছি।

অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে ডায়মন্ডহারবারের প্রার্থী

১৮ এপ্রিল গভীর রাতে দক্ষিণ ২৪ পরগণায় বিষ্ণুপুর দু'নম্বর ব্লকে বড় কাছারিতে আগুন লেগে শতাধিক দোকানপাট সম্পূর্ণ ভাবে পুড়ে যায়। নববর্ষের উৎসবের সময় দোকানে রাখা বহু জিনিস পুড়ে যাওয়ায় বিক্রেতারা সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েছেন। ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁদের ক্ষতিপূরণের দাবি নিয়ে পরদিন বিষ্ণুপুর দু'নম্বর বিডিও-তে এস ইউ সি আই (সি)-র পক্ষ থেকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

দলের ডায়মন্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী রামকুমার মণ্ডল ক্ষতিগ্রস্ত দোকানদার ও এলাকার মানুষের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন এবং বিডিওতে ক্ষতিপূরণের দাবি নিয়ে ডেপুটেশন দেওয়ার কথা জানান। দাবি করা হয়েছে, ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করে পুড়ে যাওয়া দোকানঘর অবিলম্বে পুনঃনির্মাণ করতে হবে। ক্ষতিগ্রস্তদের যথাযথ ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করতে হবে এবং অগ্নিনির্বাপণের স্থায়ী ব্যবস্থা করতে হবে।

‘এ পার্টির মূল শক্তি সঠিক আদর্শ ও সঠিক রাস্তা’

একের পাতার পর

ঘরের ছেলে আর মজুর চাষি ঘরের ছেলেপুলে, বা ওরই মধ্যে কেউ একটু চাকরি করে মোটামুটি জীবনযাপন করে— এই হচ্ছে তখন আমাদের পার্টির কর্মীদের, এমনকি সাপোর্টারদের ক্যাটিগরি (অবস্থা)। এই নিয়ে আমাদের পার্টির কাজকর্ম শুরু। তখন দিন আনা দিন খাওয়ার মতো অবস্থা আমাদের। ফলে একদম শুরু থেকে আমাদের কর্মীরা— এমনকি এমএ, বিএ পাশ করা গুটিকয়েক শিক্ষিত কর্মী, শিক্ষক, অধ্যাপক— যাঁরা তখন পার্টির আদর্শে আকৃষ্ট হয়ে এসেছিল, এমন সব কর্মীদেরও রাস্তায় বাক্স নিয়ে সারাদিন ঘুরে মুখে রক্ত তুলে পাবলিকের থেকে অর্থসংগ্রহ করে আমাদের খরচ চালাতে হয়েছে। সকল রাজনৈতিক দল আমাদের কোণঠাসা করতে চেয়েছে। ঠাট্টা টিটকারি করে বলত, চামচিকাও পাখি আর এস ইউ সি-ও পার্টি। কাজেই আমাদের সাথে আবার কথাবার্তা বলার কী আছে? তারা ইউনাইটেড ফ্রন্টেও আমাদের রাখতে চায়নি। আজ যদি দলের মধ্যে কিছু নেতা সৃষ্টি হয়ে থাকে, যদি নাম কিছু হয়ে থাকে, কিছু ইজ্জত হয়ে থাকে, তবে সেটা বুর্জোয়া প্রেস তৈরি করে দেয়নি। বিন্দু বিন্দু রক্ত দিয়ে জনতার আন্দোলন, কর্মীদের অক্লান্ত পরিশ্রম, দেশে কিছু ভাবগত আন্দোলন এবং সংগ্রামের কন্ট্রিবিউশনের মারফত তা সৃষ্টি হয়েছে। বুর্জোয়ারা তা করে দেয়নি, প্রেস তা করে দেয়নি। কোনও প্ল্যাটফর্ম কেউ দেয়নি। যেমন করে অন্য সব ছোট পার্টিগুলো ঐ সিপিআই, না হয় সিপিএম-এর লেজুড়বৃত্তি করে, না হয় ওদের তোষামোদি করে এই প্ল্যাটফর্ম, সেই প্ল্যাটফর্ম থেকে নেতা হচ্ছে— এ দলের কোনও নেতা তেমন করে সৃষ্টি হয়নি। তাদের দয়াদাক্ষিণ্যে এ দলে কেউ নেতা হয়নি। এই দলের কর্মীরা এক সঙ্গে লড়াই করেছে কিন্তু তোষামোদ করেনি, তাদের দাসত্ব স্বীকার করেনি বলেই সকল দলেরই ক্ষোভ। তাদের ভাবখানা ছিল, ছোট একটা পার্টি তার এত তেজ! তা সত্ত্বেও যদি কিছু নেতা সৃষ্টি হয়ে থাকে এ দলে, সেটা হয়েছে নিজেদের কর্মপ্রচেষ্টায় এবং রক্ত ঢেলে।

...

স্বাধীনতার পরে একদিকে কংগ্রেস, আর একদিকে কমিউনিস্ট পার্টি। তা ছাড়া সোসালিস্ট পার্টি, আরএসপি, ফরওয়ার্ড ব্লক— সেগুলোও তখন অনেক বড় পার্টি। অত বড় সোসালিস্ট পার্টি ভাঙতে শুরু করল। কমিউনিস্ট পার্টি ভাঙতে ভাঙতে আজ তিন টুকরো। আবার তারাও আরও টুকরো হতে যাচ্ছে। সোসালিস্ট পার্টি ছাড়াও আরএসপি, ফরওয়ার্ড ব্লক এইসব পার্টিগুলো ভাঙতে ভাঙতে ক্ষয় হতে হতে এখন কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে। আর সেই সময়ে আমাদের পার্টি কয়েকটা হাতে গোনা আনকোরা কর্মী নিয়ে একটা পার্টি গঠন করার চেষ্টা চালাচ্ছে। সে সময় আমাদের তো ঝড়ে উড়ে যাওয়ার কথা ছিল। যার আন্তর্জাতিক ব্যাকিং নেই, বরং যারা প্রকৃত কমিউনিস্ট নয় বলে আলাদা দল গড়ে তুলছি, তারা সেই ব্যাকিং পাচ্ছে। অন্য দিকে অভিজ্ঞ কর্মী নেই, নামকরা সর্বভারতীয় নেতা নেই, প্রেস পাবলিসিটি নেই, সমস্ত দলের সম্মিলিত আক্রোশ এবং বিরুদ্ধতা— তার মধ্যে ক্রমাগত শক্তি সঞ্চয় করে আজ এই জায়গায় এসে এই পার্টিটা দাঁড়িয়েছে। এ কি সোজা শক্তি? এ শক্তি কিসের শক্তি? এ আসতে পেরেছে এই কারণে যে, এর আদর্শ এবং রাস্তা সঠিক ছিল। এর কি কোনও ভুলভ্রান্তি নেই, এর সবই কি ঠিক, এর প্রতিটি নেতা কি সবসময় সঠিক আচরণ করেন, প্রতিটি কর্মী কি সবসময় সঠিক আচরণ করে? না, এ সব দাবি আমরা করতে পারি না, আমরা এ সবের বিরুদ্ধে সজাগ এবং এগুলো দূর করার চেষ্টা চালিয়ে যাই। তবে এ কথাটা খেয়াল রাখবেন, এই সব কথার দ্বারা মূল কথাটা আপনাদের যেন গোলমাল না হয়। মূল কথাটা হল— সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ পরিবেশে, প্রবল অ্যান্টি কারেন্টের বিরুদ্ধে কী সেই প্রবল শক্তি যার ওপর ভিত্তি করে পার্টিটা আজ এই জায়গায় এসেছে। সে শক্তিটা হল, এই পার্টিটা একটা মূল আধারের উপর, সঠিক আদর্শ আর কতকগুলো দৃঢ়চেতা কর্মী, যাদের বিপ্লবী চরিত্রের একটা মান আছে, যে কোনও অবস্থাতে সে ফাইট করে, তারা মাথা নিচু করে না, কুসংস্কার মুক্ত, আর যে-কোনও অবস্থা মোকাবিলা করার জন্য সব সময় তৈরি হয়ে আছে।

... মানুষের সামনে এই সত্যটা সঠিকভাবে উপস্থাপনা কর— একদিকে যত বড় বড় পার্টি, সব ক্ষয়ের দিকে যাচ্ছে, আর সেখানে এই একটি মাত্র পার্টি স্লোলি বাট স্টেডিলি (ধীরে কিন্তু দৃঢ়ভাবে) ইনস্পাইট অফ মেনি ডিফিকাল্টিজ গ্রোইং। ট্রাই টু লার্ন ফ্রম ইট— তবে তুমি বুঝতে পারবে এই আদর্শের সঠিকতা কতখানি দৃঢ় ভিত্তিমূলের উপর দাঁড়িয়ে আছে। এ পয়সা দিয়ে তৈরি করা পার্টি নয়, এ কতকগুলো নেতার মিথ্যা মোহ সৃষ্টি করা পার্টি নয়, এ পার্টি নেতা-কর্মীদের বিন্দু বিন্দু রক্ত দিয়ে তৈরি হচ্ছে প্রতিদিন প্রতিটি কর্মক্ষেত্রে। ফলে এর শক্তি যদি দেখতে না পাও এবং দেশের মানুষ যদি দেখতে না শেখে, আমি বলব ঠকবে তারাই।”

বিপ্লবী জীবনই সর্বাপেক্ষা মর্যাদাময়

শিবদাস ঘোষ

Editor : Amitava Chatterjee Printed & Published by Amitava Chatterjee on behalf of SUCI (C), West Bengal State Committee from 48 Lenin Sarani, Kolkata 13 ■ Printed at: Ganadabi Printers and Publishers Pvt. Ltd. 52B Indian Mirror Street, Kolkata-13 Phone: 9433451998, 9432889347 E-mail: ganadabi@gmail.com ■ Web: https://ganadabi.com